"PARACHARCHA" by Bhupendra Nath Basu

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশিকা : কল্পনা বসু
মহিলা কলেজ, মতিহারী
বিহার

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রক : শ্রীদিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১।১ বিধানসরণী, কলিকাতা-৬

নিবেদন

প্রায় আটষট্টি বছর পৃথিবীতে থাকবার পর যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে এসেছে, যা ভাল লেগেছে, যা ভাল লাগে নি, তাই কিছু কিছু লিখেছি, কারুকে হেয় করবার উদ্দেশ্যে নয়।

দেশের অনেক সমস্যার কথাও বলা হয়েছে। তার সমাধানের জ্ঞান লেখকের নেই, দেশের বিশেষজ্ঞরা ও রাজনীতিবিদ্‌রা সেটা করবেন।

লেখাতে আপাতদৃষ্ট অসামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। কিন্তু মানুষমাত্রেই, এমন কি যাঁরা কীর্তিমান তাঁরাও, অসামঞ্জস্য রোগে ভোগেন। এটাকে খুঁত না বলে বলা যায় মানুষের স্বভাব; কেন না এর বিচার করবে কে, যখন সকলেরই এটা মজ্জাগত।

লেখাতে সাধারণ ভাবে মত প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

এ লেখা ইনটেলেকচুয়ালদের জন্যে নয়, সাহিত্যিকদের জন্যেও নয়। এ শিক্ষিত সাধারণ পাঠকদের জন্যে।

ভুলচুক যা আছে তা অজ্ঞতার ফল।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

সূচীপত্র

পরচর্চা

আমরা কোথায়?

ভারতের বর্তমান অবস্থা কি? পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের স্থান কোথায়? মোটামুটিভাবে এর বিচার করা যাক। প্রথমে দেখা যাক ভারতের ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় আয় কিরূপ। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে গড়পড়তা প্রতি লোকের (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী) বাৎসরিক ডলারে (১ ডলার প্রায় সাড়ে সাত টাকার সমান) আয় হল—

দেশ	মাথাপিছু বাৎসরিক আয় (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	৩,৫২০
কানাডা	২,৫৩০
সুইডেন	২,৩৬০
সুইটজারল্যাণ্ড	২,২৫০
ফ্রান্স	২,১৪০
অস্ট্রেলিয়া	১,৮৭০
ডেনমার্ক	১,৮৭০
বৃটেন	১,৪৬০
ইতালি	১,১৯০
জাপান	১,০৮০
রাশিয়া	৮৯০
ভারত	৯০

এ থেকে দেখা যাচ্ছে গড়পড়তা প্রতি লোকের মাসিক আয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২,২০০ টাকা, ব্রিটেনে প্রায় ৯১২ টাকা, জাপানে প্রায় ৬৭৫ টাকা আর ভারতে মাত্র ৫৬ টাকা।

উন্নত দেশগুলি এখন পুরোপুরি জড়বাদ অনুসরণ করে চলেছে। এখন হল ইস্পাতের যুগ। কোন্ দেশ কত এগিয়েছে তার মাপকাঠি হল, কোন্ দেশ কত ইস্পাত তৈরী করে। কতকগুলি দেশের ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের হিসেব দেওয়া হল ; এ সব দেশের লোকসংখ্যাও দেওয়া হল—

দেশ	বাৎসবিক ইস্পাত-উৎপাদন (কোটি টন)	লোকসংখ্যা (কোটি)
যুক্তরাষ্ট্র	১৩'১৫	২০'০০
রাশিয়া	১১'০০	২৪'০০
জাপান	৮'২১	১০'০০
পশ্চিম জার্মানি	৪'৫৩	৬'৮০
ব্রিটেন	২'৬৮	৫'৫০
ইতালি	১'৬৪	৫'০০
বেলজিয়াম	১'২৮	১'০০
ভারত	০'৭০	৫১'০০

ইস্পাত তৈরীর প্রধান উপাদান (কাঁচা মাল) লোহা-পাথর, কয়লা, চূণাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ। ভারতে এর প্রত্যেকটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারত যদি ইস্পাত তৈরী তিনগুণ বাড়ায় তা হলেও এসব কম পড়বে না। তবে তার

উপরে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে ম্যাঙ্গানিজে টান পড়বে। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা, কেন না ৭০ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টন ইস্পাত তৈরী করা সহজ ব্যাপার নয়।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালে ইস্পাত শিল্পে কতটা উন্নত ছিল তার নিদর্শন হচ্ছে দিল্লীর ঐতিহাসিক লৌহস্তম্ভ, যা এখন উন্নতিশীল দেশের পর্যটকেরা অভিভূত হয়ে দেখেন। অথচ এমন যে দেশ ভারত—যার কাঁচা মালের কোন অভাব নেই, আর যার লোকসংখ্যা বর্তমানে ৫৫ কোটির কাছাকাছি —সে ইস্পাত তৈরী করছে বছরে ৭০ লক্ষ টন। আর যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ২০ কোটি, তার বাৎসরিক ইস্পাত তৈরীর পরিমাণ ১,৩১৫ লক্ষ টন। অর্থাৎ ভারত মাথাপিছু ১৩ কিলোগ্রাম ইস্পাত উৎপাদন করে, আর যুক্তরাষ্ট্র করে ৬৬০ কিলোগ্রাম। বৃটেনের মাথাপিছু ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ৫০০ কিলোগ্রাম। এই ভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে ভারতের স্থান কত নীচে, এত কাঁচা মাল আর এত লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও।

আর একটা হিসেব দেওয়া যাক। এটা সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানে তুলনামূলক কৃতিত্বের হিসেব। এতেও দেখা যাবে অন্য সব দেশের তুলনায় ভারত কত পেছনে পড়ে আছে। এ হিসেবটা হল

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ অবধি কোন্ দেশ কত নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তার—

দেশ	পদার্থবিদ্যা	রসায়নবিদ্যা	চিকিৎসাবিদ্যা	সাহিত্য	শান্তি	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	২১	১২	২২	৬	৮	৬৯
জার্মানী	১৫	২১	১১	৫	২	৫৪
বৃটেন	১৪	১৫	১২	৬	৪	৫১
ফ্রান্স	৫	৪	৫	১০	৭	৩১
সুইডেন	২	৪	৪	৫	৩	১৮
সুইটজারল্যাণ্ড	১	২	৩	২	৪	১২
ইতালি	২	১	২	৪	১	১০
ডেনমার্ক	১	—	৪	২	১	৮
রাশিয়া	৩	১	১	২	—	৭
হল্যাণ্ড	৩	১	২	—	১	৭
বেলজিয়াম	—	—	২	১	৪	৭
অস্ট্রিয়া	২	—	৩	—	১	৬
নরওয়ে	—	১	—	৩	২	৬
আয়ারল্যাণ্ড	১	—	—	২	—	৩
পোল্যাণ্ড	—	—	—	২	—	২
স্পেন	—	—	—	২	—	২
জাপান	২	—	—	১	—	৩
ভারত	১	—	১	১	—	৩

সবচেয়ে বেশী নোবেল পুরস্কার পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (৬৯), তারপর জার্মানী (৫৪), ব্রিটেন (৫১), ফ্রান্স (৩১) ইত্যাদি। বেলজিয়াম যে এত ক্ষুদ্র একটি রাজ্য এবং পাশ্চাত্ত্য

মানে তত উন্নতও নয়, সেও পেয়েছে ৭টা পুরস্কার; আর ভারতবর্ষ কিনা পেয়েছে মাত্র ৩টা!

যাক, কেউ কেউ বলতে পারেন যে, প্রায় সাত শতাব্দীর পরাধীনতায় জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, দেশের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, পরাধীনতা এল কেন, দেশ কেন মাথা তুলে দাঁড়াল না; কেন নির্জীব, ভীরু, নিষ্কর্মা হয়ে বসে রইল, কেন অপমান সহ্য করল?

আবার কেউ হয়ত বলবেন, ভারত জড়বাদে বিশ্বাস করে না, ভারত আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যাদের পেটে ভাত নেই তাদের কি আধ্যাত্মিকতা করা সাজে? বিদেশীদের আমাদের সম্বন্ধে ধারণা যে, আমরা অনুন্নত, অকর্মণ্য; আমরা খেতে পাই না, আমরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এটা কি কম অপমানের কথা? পৃথিবীর চোখে শ্রদ্ধা হারিয়ে আধ্যাত্মিকতা করার কোনো মানে হয় না।

মোট কথা, যে কোনো দেশের বা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় তার অর্থোপার্জনের ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি দিয়ে। এটাই আসল বিচার। তা ছাড়া অবশ্য ছোটখাট ব্যাপারেও কৃতিত্ব অর্জন করা যায়। যেমন ভারতের কৃতিত্ব হকি খেলায় ও কুস্তিতে। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারে আমাদের কৃতিত্ব আছে। তা হল হিপি তৈরী করার!

আটশ' নশ' বছরের জড়তা কাটিয়ে, স্বার্থপরতা শঠতা ত্যাগ

করে, আর বেশী বাক্‌চাতুরী না করে, এখন একটু মস্তিষ্ক ও দেহ চালনা করা দরকার। আমরা কেবল পুরাকালের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অহংকার করি। আমাদের সবই 'ছিল', 'আছে' বলে কিছু নেই। এবার থেকে একটু ভবিষ্যৎ ভাবা যাক, যাতে অর্থে ও বিদ্যায় আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারি।

সরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং প্রকল্পের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

বৃটিশরা চলে যাবার পর সরকারী উদ্যোগে বিদেশী সহযোগিতায় অনেকগুলি বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা বা ফ্যাক্টরি ভারতে তৈরী হয়েছে। তার বেশীর ভাগই ভালভাবে চলছে না, প্রতি বছরই লোকসান হচ্ছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ভালভাবে চলবে না কেন, লোকসানই বা হবে কেন ! কিন্তু হচ্ছে কতকগুলি কারণে—

১। একটি হল রাজনৈতিক। ইউরোপের অনুন্নত দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্য বেশ সুবিধা-জনক সর্তে অন্য দেশে মেশিন কলকব্জা ইত্যাদি সরবরাহ করবার চেষ্টা করে। সেই সুবিধে নেবার জন্য, বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) সাশ্রয়ের জন্য ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ বাড়াবার জন্য, ভারত সরকার তাদের দেশ থেকে এগুলি নেন ও তার বদলে চা, চট, চামড়া, অভ্র, বাদাম ইত্যাদি দেন। ভারত সরকার সব ক্ষেত্রে ভাল করে দেখেন না যে, ও সব দেশের মেশিন নির্ভরযোগ্য কিনা, ওদের planning ও design-এর পুরো অভিজ্ঞতা আছে কিনা, এরা আগে আরও অন্ততঃ পাঁচসাত জায়গায় এ রকম কাজ করেছে কিনা এবং তা লাভে চলছে কিনা। এ সব খুঁটিয়ে না দেখার ফলে কোনো কোনো সংস্থা ঠিক ভাবে চলছে না।

২। দ্বিতীয় কারণ—নাম-করা বৃটিশ, আমেরিকান, জার্মান

ফার্মদের অর্ডার দিয়েও আমাদের ওপর-তলার ইঞ্জিনীয়াররা বিদেশী planning ও design-এর ওপর নিজেদের বিদ্যা জাহির করেন ও খরচ কমাবার অজুহাত দেখিয়ে, অদলবদল করিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। ফলে, আখেরে ৫০ কোটির জায়গায় ৭৫ কোটি খরচ হয়, ৩ বছরের জায়গায় ৫ বছর লাগে ও পরে ফ্যাক্টরি মাত্র আধা বা তিন-চতুর্থাংশ চলে ও বছরে বছরে লোকসান হয়। দেখা গেছে, যে সমস্ত কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে—একেবারে সম্পূর্ণভাবে—বৃটিশ, আমেরিকান বা জার্মান অভিজ্ঞ ফার্মকে দেওয়া হয়েছে, তা পূর্ব-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চালু হয়েছে ও নিখুঁতভাবে চলছে। অবশ্য এর জন্য অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) লেগেছে। তবে খরচ যা বেশী পড়েছে, পরে লাভে তা যথেষ্ট পুষিয়ে গেছে। যে ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলায় ও চালানোয় (দুটো আলাদা ব্যাপার) আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও নেই, সেগুলিতে সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী সাহায্য নেওয়াই উচিত।

আমাদের সরকার বা ইঞ্জিনীয়াররা অবশ্য সব দিক ভেবেই, বৈদেশিক মুদ্রা কাটছাঁট করে কাজ করতে যান, কিন্তু ফল যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় তা হয় penny wise pound foolish policy-র মত।

৩। তৃতীয় কারণ—বিদেশী সহযোগিতায় ভারতে কোনো জায়গায় কোনো প্রকল্প গড়ে তোলার সময়ে তাঁরা সেই জায়গার নদী, পাহাড় ইত্যাদির ভৌগোলিক তথ্য, বিগত ৫০।৬০ বছরের আবহাওয়ার খুঁটিনাটি খবর ইত্যাদি জানতে চান, planning

ও design-এর জন্যে। আমাদের বিশেষজ্ঞরা অনেক ক্ষেত্রে ভুল তথ্য সরবরাহ করেন ; কখন বা record না থাকার ফলে, অজ্ঞতা প্রকাশের লজ্জা এড়াবার জন্য, যা-হক-কিছু তথ্য দিয়ে দেন। এটা মারাত্মক অন্যায়। ত্রুটিযুক্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বিদেশীরা যে প্রকল্প খাড়া করেন, তা শুরুতেই অথবা দু চার বছর চলবার পরে অনেকাংশে বানচাল হয়ে যায়।

৪। চতুর্থ কারণ—ফ্যাক্টরি গড়ার কিছু আংশিক কাজ departmental কলাকুশলীদের দিয়ে করানো হয়। দক্ষতার ও অভিজ্ঞতার অভাবে কাজ নিকৃষ্ট মানের হয় ও আসল প্রকল্প চালু করতে বিঘ্ন ঘটায়।

এ সমস্ত কাজও, যে বিদেশী ফার্মকে আসল কাজের অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, তাদের দায়িত্বে ও তদারকিতে দেশীয় কনট্রাকটার দিয়ে করানো হলে আর সে বিঘ্ন হয় না ; যদিও তার জন্য বিদেশী সুপারভাইজারদের মাহিনা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা আর একটু বেশী লেগে যায়।

৫। পঞ্চম কারণ—ফ্যাক্টরিতে যে জিনিস তৈরী হয় তার জন্য নানা রকমের কাঁচা মাল সরবরাহ করতে হয়, তার quality ও quantity-র ভুল ও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হিসেব দাখিল করা।

৬। ষষ্ঠ কারণ—ফ্যাক্টরি তৈরীর সময়ে কিছু সোজা ধরনের কলকব্জা ভারত থেকে সরবরাহ করবার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ভেজাল মেশানো ও নিকৃষ্ট মানের হওয়ার দরুন সেই

কলকব্জায় ঠিকমত কাজ চলে না। ফাঁকি, চুরি ও দক্ষ তদারকির অভাবের দরুনই এ ব্যাপার হয়।

৭। সপ্তম কারণ—ফ্যাক্টরি চালাবার দু'-তিন বছরের মধ্যে কিছু অত্যাবশ্যক জটিল (essential and complicated) spare parts-এর দরকার হয়। সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ও ইঞ্জিনীয়ারদের practical experience-এর অভাবে বিদেশী ফার্মের উপরোধ সত্ত্বেও এই সব জটিল spare parts-এর অর্ডার বাতিল করে দেন, বলেন যখন দরকার পড়বে তখন তৈরী করা হবে, অথবা 'করছি করব' বলে কাজ ফেলে রেখে দেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয় যে দরকারের সময়ে spare parts তৈরী করতে গেলে দেখা যায় তৈরী করতে অনেক সময় লাগে, দাম বেশী লাগে আর যা বা তৈরী হয় তাতে কাজ চলে না। ফলে মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকে।

৮। অষ্টম কারণ—মেশিন চালু রাখবার জন্য (বড় বড় প্লান্টের কথা বলা হচ্ছে) আমাদের বহু সংখ্যক দক্ষ practical ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর দরকার। এ দক্ষতা কম সময়ের মধ্যে আয়ত্ত হয়, যদি তারা মন দিয়ে কাজ শেখে আর যেখানে বিদেশী কারিগররা কাজ করছে তাদের সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু কর্ম-বিমুখতা ও ডিসিপ্লিনের অভাবে তা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তার ওপর অনেক সদ্য-পাশ-করা ইঞ্জিনীয়ার বলে থাকেন, আমরা boss-দের চেয়ে বা ওই বিদেশী লালমুখোদের চেয়ে ঢের বেশী জানি, ওদের কাছ থেকে আর শেখবার কিছু নেই।

আর, 'কোনো রকমে কাজ চললেই হল' এই মনোভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে। সব কাজ, বড় বা ছোট, নিখুঁত-ভাবে করা চাই, তবেই তা দীর্ঘকাল চলবে—এই আদর্শ আমরা মেনে চলি না।

৯। নবম কারণ—পাশ্চাত্ত্যদেশে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির (automatic devices) বহুল প্রচলন হয়েছে। উদ্দেশ্য কর্মী-সংখ্যা কম রাখা ও efficiency বাড়ানো। ভারতবর্ষেও সেই রকম যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। কিন্তু এত বেশী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র না থাকলেই ভাল হত, কেন না এই সব যন্ত্র চালু রাখতে যে বিশেষ দক্ষতার দরকার তার অভাবে মেশিন সব সময়ে ঠিকমত চলে না ও মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, সাময়িকভাবে উৎপাদন কম হয়ে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি লাগানো আছে কিন্তু তা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, মেশিন হাত দিয়ে চালানো হচ্ছে; তার জন্যে বাড়তি লোক নিয়োগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ, অনর্থক বেশী টাকা খরচ করে এত সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছিল।

১০। দশম কারণ—Lowest tender মঞ্জুর করার সময়ে 'সস্তার তিন অবস্থা' এই কথাটা একটু খেয়াল রাখা দরকার। আর purchase committee এবং purchase department-এর ওপর কড়া নজর না রাখলে এগুলি একটা সর্বনেশে জায়গা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১১। একাদশ কারণ—ওপর-তলার কর্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

অন্য সংস্থার ওপর-তলার কর্তার রেষারেষি বা মর্যাদার লড়াই। এটা এই মনে করিয়ে দেয়, আমাদের কাছে দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ বা মিথ্যা আত্মসম্মান বড়।

কলকাতায় পাতাল রেলের (underground railways) জন্য জল্পনাকল্পনা অনেক বছর ধরে চলছে; বিলিতী, ফ্রেঞ্চ, জাপানি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিকল্পনাও পেশ করেছেন, ভারতের টাকাও খরচ হয়েছে। সম্প্রতি আবার রুশ বিশেষজ্ঞরা এসেছেন। আবার শুনছি, আমাদের দেশেই নাকি পাতাল রেলের বিশেষজ্ঞ আছেন; তাঁরা এটা করতে চান। (তবেই পাতাল রেল হয়েছে! পাতাল রেল একেবারে পাতালে না চলে যায়!) এই বার পাতাল রেল কে করবে এই নিয়ে ঝগড়ার পর্ব চলবে।

প্রসঙ্গত বলি, কলকাতার গঙ্গার তলায় ground level থেকে ১০৫ ফুট ও river bed থেকে ৪০ ফুট নিচে একটা ১,৭৩৫ ফুট লম্বা ৬ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গ আছে, মেটেবুরুজ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে। লোকে একটু মাথা নিচু করে হেঁটে এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যেতে পারে। দু' পাড়েই ওঠানামার লিফট আছে। এর ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক কেবল্ গেছে। ৩৮ বছর আগে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে এটা তৈরী করিয়েছিল। গঙ্গার তলায় সুড়ঙ্গ যখন করা গেছে তখন ট্রেনের সুড়ঙ্গ কলকাতা শহরের তলায়ও নিশ্চয় করা যেতে

পারবে। এই সুড়ঙ্গের বিবরণ দিতে গিয়ে ১২-২-১৯৩২ তারিখের Statesman পত্রিকা বলেছিল—"It unquestionably shows that the construction of the tube railway is a feasible project in the city." ৩৮ বছর পরেও পাতাল রেল তৈরীর কিছু ঠিক হল না। আরও ৩৮ বছর পরে অর্থাৎ ২০০৯ খৃষ্টাব্দে যদি এই রেল চলে তো কলকাতাবাসীরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবেন।

আর ধরুন সি. এম. ডি. এ. (Calcutta Metropolitan Development Authority) সংস্থা—যারা কলকাতা শহরের গর্তওয়ালা রাস্তা সারাবে, বোজা ড্রেন পরিষ্কার করবে, দরকার-মত আরও ড্রেন বাড়াবে যাতে শহরে ও উপকণ্ঠে বর্ষার জল না জমে, বস্তির উন্নয়ন, যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যা বাড়ানো ইত্যাদি কাজ করবে। কলকাতা পৌরসভা বলছেন—এগুলো ওঁদের কাজ, টাকা পেলে ওঁরা করবেন, ওঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কিন্তু পৌরসভা এতকাল ধরে শহরের এই সব অসুবিধে দূর করতে পারে নি বলেই সি. এম. ডি. এ. গড়া হয়েছে। অতএব সি. এম. ডি. এ. এই কাজ করবে।

পাতাল রেল বলুন বা সি. এম. ডি. এ. বলুন, এ সবই খেয়োখেয়ির ব্যাপার—কে কাজ করবে, কে কাজ করবে না। শেষ অবধি হবে 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ'। এ প্রবাদটা যিনি জানেন না তাঁর জন্য একটু ব্যাখ্যা করছি। একবার ভূতেরা মিলে ঠিক করল, যেমন মানুষদের বাপের শ্রাদ্ধ হয় তেমনি তাদের বাপের শ্রাদ্ধ করতে হবে। এই ঠিক

করে তারা একটা মাঠে শ্রাদ্ধের সব আয়োজন করল। কিন্তু শ্রাদ্ধের জন্য একজন পুরুতঠাকুর দরকার, তা কি করে পাওয়া যায়? সেই সময়ে সেই মাঠের এক ধার দিয়ে এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। ভূতেরা গিয়ে তাঁকে ধরে বলল, তাদের বাপের শ্রাদ্ধ করতে হবে, আয়োজন সব তৈরী। ব্রাহ্মণ তো ভয়ে অস্থির, বুঝলেন যে, এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। মনে মনে মতলব আঁটতে লাগলেন, কি করে পার পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের জায়গায় গিয়ে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, কার বাপের শ্রাদ্ধ হবে? ভূতেরা সকলেই বলতে লাগল, আমার বাপের, আমার বাপের। ব্রাহ্মণ তখন বললেন, আজ কেবল একটা শ্রাদ্ধ হতে পারে। তা তোমাদের ভেতরে যে প্রধান আজ কেবল তার বাপের শ্রাদ্ধ হবে; এখন বল তোমাদের ভেতরে কে প্রধান? তখন সকলেই বলতে লাগল, আমি প্রধান, আমি প্রধান। খুব চেঁচামেচি হতে লাগল, তারপর কথা কাটাকাটি, তারপর মারামারি। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণ পালিয়ে গেলেন। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ তাহলে কি ভাবে সমাধা হল, বুঝতেই পারছেন।

১২। দ্বাদশ কারণ—সরকারী সংস্থায় মিটিং ও কার্যসূচীর খসড়া প্রায়ই হয় ও একটু বেশী করেই হয়, কিন্তু এই সব কার্য-সূচীর নানান কাজ উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে ও লালফিতার জটিলতায় শেষ অবধি আর পুরোপুরি হয়ে ওঠে না। ফলে উৎপাদন ঠিকমত হয় না, জনসাধারণ দুর্গতি ভোগ করে, খরচ বেশী পড়ে যায় ও বছরে বছরে লোকসান হয়। তা হোক।

মিটিং ও কর্মসূচীর খসড়া তো নিয়মিত মাঝে মাঝে করা হয়েছিল, তা হলেই হল।

১৩। ত্রয়োদশ কারণ—স্ট্রাইক ও work-to-rule। শ্রমিকেরা দাবী পূরণের জন্য এসব পন্থা নিলে সমস্যা জটিলতর হয়ে যায়। উৎপাদন কমে যায়, জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয় ও তার দাম বেড়ে যায়, দেশের সাধারণ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের কিছু করবার আগে শ্রমিকদের রীতিমত পরিশ্রম করে উৎপাদনহার বাড়িয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে সংস্থা লাভেতে চলছে; অতএব তাদের প্রাপ্য আরও বাড়ানো উচিত।

আসল কথা—Salvation lies in productivity। উৎপাদনবৃদ্ধিই সমস্যা সমাধানের উপায়।

আগে যা লেখা হ'ল তার সারমর্ম হ'ল দুর্গত সরকারী ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্গতির জন্য দায়ী রাজনীতি-বিদ্‌দের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, ওপর-তলার technical লোকদের অজ্ঞতা এবং ওপরচালাকি, কিছু লোকের সততার অভাব, নিচুতলার লোকদের কুঁড়েমি ও লালফিতার বাঁধনের বাড়াবাড়ি। কিছু ওপর-তলার লোক আছেন, তাঁরা যে কী সর্বনাশ করছেন তা ধরা বড় মুস্কিল; কেন না প্রকল্প বা প্ল্যাণ্টের কাজ কেন ঠিক ভাবে চলছে না (ঠিক ভাবে না চলাটাই সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে) তাঁরা তার চমৎকার রিপোর্ট লিখতে পারেন, নিজেদের এবং নিজেদের পেটোয়া লোকদের বাঁচিয়ে,

রিপোর্টের ভাষার এমন সুন্দর বাঁধুনি যে ওঁরা সাহিত্যিক হলে বা উকিল হলে বিখ্যাত হতে পারতেন।

সরকারী সংস্থায় কখন কখন আর-এক রকম ধাপ্পাবাজি চলে। যেমন ধরুন, একটা প্ল্যাণ্ট ২০ কোটি টাকা খরচে তৈরী হল এবং বলা হল বছরে এক লক্ষ ইউনিট মাল উৎপাদন হবে। তারপর প্ল্যাণ্ট চলবার প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর এবং তৃতীয় বছরেও ৬৫ থেকে ৭০ হাজার ইউনিটের বেশী উৎপাদন হল না। তখন বড় কর্তারা মিটিং করে ঠিক করলেন যে, সামনের বছরের জন্য উৎপাদনের লক্ষ্য (target) ৭৫ হাজার ইউনিট করতে হবে। তারপর বছরের শেষে যদি এর চেয়ে কম হয় তো একটা কিছু অজুহাত দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন ও বলেন যে, আমরা উন্নতির চেষ্টা করছি। আর যদি উৎপাদন ৭৬ হাজার হয় তো হৈ হৈ করে খবরের কাগজে প্রচার করেন production exceeded the target। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। জনসাধারণ কাগজ পড়ে খুব বাহবা দিল। তারা টের পেল না যে, প্রকৃতপক্ষে প্ল্যাণ্ট ঠিক চলছে না, প্ল্যাণ্টের পরিকল্পনায় অথবা চালনায় কিংবা এই দুই ব্যাপারেই গলদ আছে; কেন না ২০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল এক লক্ষ ইউনিট উৎপাদনের জন্য, ৭৫ হাজারের জন্য নয়। এই ভাবে দেশের জনসাধারণকে, দরকার পড়লে, ধাপ্পা দেওয়া হয়।

এত কথা বলবার কারণ এ নয় যে, আমরা চিরকালই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব, তা একেবারেই নয়। যে সমস্ত

কাজে আমাদের এখনও পুরো দক্ষতা আসে নি, সেই সব কাজ আরও কিছু কাল দক্ষ বিদেশীদের দিয়ে করাতে ও তাদের কাছে শিখে নিতে হবে। তারপর অবশ্যই আগাগোড়া সবটাই আমাদের দেশের লোকেরাই করবে, কেবল আরও কিছু সময়ের দরকার।

ইতিমধ্যে আমাদের administration-এর সংস্কার হওয়া দরকার যাতে লোকে মন দিয়ে কাজ করে ও ডিসিপ্লিনে শ্রদ্ধাবান্ হয়। কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে, ফাঁকি দিলে বা নষ্টামি করলে সরকারী প্রকল্পের কর্মীকে শাস্তি দেবার আইন যদিও আছে, কার্যত তাকে শাস্তি দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। সংস্থা বা ফ্যাক্টরি যত পুরানো হতে থাকে, শাস্তি না পাবার উদাহরণ তত বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলাও বাড়তে থাকে, আর উৎপাদন কমতে থাকে। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন কি করে সম্ভব হবে? এখন এটা জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় বা party politics-এ দাঁড়িয়ে গেছে। দেশনেতাদের শ্রমিকদের প্রতি প্রধান পরামর্শ হবে—'আগে উৎপাদন বাড়াও'। যাই হোক, এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা এর সমাধান করবেন।

মোটামুটি যা কথা দাঁড়াচ্ছে আর সরকারকে যা করবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করতে হবে, তা হল এই—

১। রপ্তানি বাড়াতেই হবে, যাতে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ আরও বেশী আনতে পারা যায়।

২। খাদ্যশস্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার খরচ যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করতে হবে।

৩। যে কোনো বিলাস দ্রব্যের জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ এখনই একেবারে বন্ধ করা। প্রসঙ্গত একটা দৃষ্টান্ত দেই। যে স্টেন্‌লেস স্টীল, কলকব্জা বানানোর জন্য একটা অত্যন্ত দরকারী ধাতু, সেটা কিনা আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করছি থালা বাটি গেলাস তৈরীর জন্য আর তার জন্য আমাদের সরকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করছেন।

৪। সদ্য-পাশ-করা ইঞ্জিনীয়ারদের প্রাকটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হতে হবে। যে সব বিদেশী মিস্ত্রী ভারতে কোনো প্রকল্পের জন্য কাজ করতে এসেছে তাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। ছ' মাসের জন্যে বিদেশে ট্রেনিং-এ যাওয়া মানে কেবল দেশ ভ্রমণ করা; কাজ শেখা কিছু হয় না। ইঞ্জিনীয়াররা বিদেশে ট্রেনিং-এ গেলে অন্তত এক বছর বিদেশী মিস্ত্রীদের সঙ্গে ও অন্তত আরও এক বছর বিদেশী ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে।

৫। কোন-রকমে-কাজ-চালানোর মতো করে কাজ করতে দেওয়া হবে না।

৬। পুরো কাজ না করলে শাস্তি দেওয়া হবে।

৭। ঘুষ যাতে না নিতে পারে তার জন্য কড়া বন্দোবস্ত করা। ঘুষ নিলে, অবস্থা বুঝে, ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

৮। মাল তৈরীতে ভেজাল দিলে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

৯। প্রত্যেক স্তরের কর্মীদের বেতন দায়িত্ব ও কাজ অনুযায়ী কিনা দেখতে হবে। আর দেখতে হবে কর্মীদের যে বেতন দেওয়া হবে তাতে তাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন, সুখ-সম্পদ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্য দুটি পয়সা সঞ্চয় হয় কিনা। সরকারের উদ্দেশ্য হবে, বেশী টাকা দেব, কাজও বেশী করাব।

এত সব জটিল সমস্যার মোকাবিলা করা বিচক্ষণ প্রশাসক, বিচক্ষণ ইঞ্জিনীয়ার ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌দের দূরদর্শিতা ও sincere team-work ছাড়া সম্ভব নয়। জলঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ ও দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্টের ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। 'সরকারী প্রকল্প মানেই লোকসানের ডিপো'—এই চালু কথাটা আমাদের মিথ্যে প্রমাণ করতেই হবে।

এ লেখা ভাল মনে, দেশের ভালর জন্যে, জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্যে পেশ করা হল যাতে সকলে সাবধান হয়।

চিত্রপ্রদর্শনী

বেশ কয়েক বছর ধরে চিত্রপ্রদর্শনীর একটু বেশী হিড়িক চলেছে। খবরের কাগজে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত সমালোচনা বেরয়। সমালোচনার ভাষা এই রকম— 'রেখা স্বাবলীল ও অনুভূতি-প্রধান', 'বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য', 'স্টাইলের বৈচিত্র্য', 'পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি', 'শিল্পী দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে প্রগতিবাদের নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন,' 'ছবির মেজাজ রোমান্টিসিজম-ঘেষা', 'এক্সপ্রেসনিজম-এর ছাপ,' 'বলিষ্ঠ মুন্সিয়ানা দেখানো হয়েছে', ইত্যাদি ইত্যাদি। সমালোচনায় 'শিল্পীর আঁকা ছবি' বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, বলতে হবে 'শিল্পীর একটি সৃষ্টি'।

আমি মাঝে মাঝে চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে যাই। মানুষের মূর্তি, গ্রাম বা শহরের ছবি, পশুপক্ষী, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি আঁকার প্রতি আজকাল বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুত্ব দেওয়া হয় এমন ছবিকে যা দেখে খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়ে মানে বের করবার চেষ্টা করতে হয়, আর যদি মানে বের করতে না পারেন তবে আপনি গবেট! একে বলা হয় impressionistic style-এর চিত্রকলা।

এই সব দেখেশুনে আমারও ছবি আঁকবার ইচ্ছে হল এই

স্টাইলে। এই ধাঁচের ছবি আঁকলে কারুর ধরার সাধ্য নেই যে ছবি আঁকার রীতিমত শিক্ষা পেয়েছি কি পাই নি। যাক, কতকগুলো আঁকলুম। যেমন—
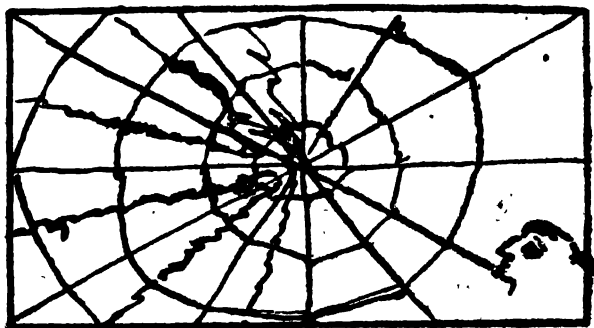
এখন এটার কী নাম দেওয়া যায়? ছবির caption-টাই আসল। যদি ঠিক নাম দিতে হয় তো বলতে হয় "হিজিবিজি"। কিন্তু তা বললে শিল্পীর মান থাকে না। ছবিতে গালভরা বা রহস্যভরা নাম দিতে হয়, তবেই তার মূল্য। তাই ভেবেচিন্তে এতে একটা মুখ এঁকে নাম দিলুম "জীবনসমস্যা" বা "Problems of Life"।

আর একটা ছবি আঁকলুম—
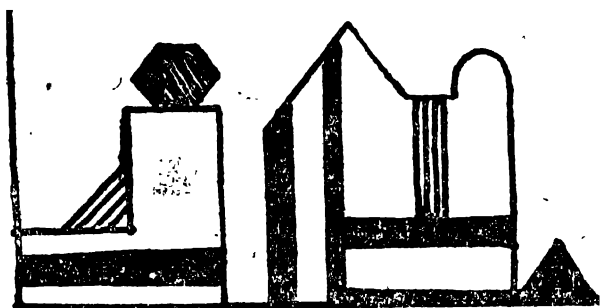
এটার caption দেওয়া যাক "Composition"। ছবির মর্ম সমালোচক বের করবেন, আমি জানি না।

আর একটা ছবি আঁকা যাক। বাড়ীর সামনে চীনেবাদাম ভাজার দোকানে তোলা উনুনে আগুন দেওয়ার পর খুব ধোঁয়া বেরুচ্ছে।
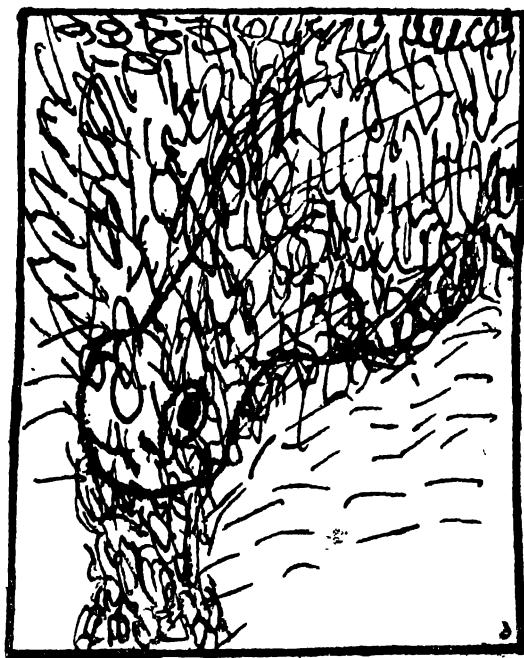
এটা এই ধোঁয়ার ছবি-

কিন্তু ছবিটার নাম দিলুম "নারী"। নারীর সঙ্গে ছবির কী সম্পর্ক যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তার সদুত্তর দিতে পারব না। এ ধরনের জিজ্ঞাসা আজকাল কেউ করেন না, কারণ আধুনিক শিল্পজগতে এটা বে-দস্তুর। শিল্পী ছবি এঁকে যাবেন, তার মানে বোঝা যাক বা না যাক, তার তারিফ করাটাই হল এখনকার রীতি।

"নারী" নাম দিয়ে আর একটা ছবি আঁকলে হয়, যেমন—
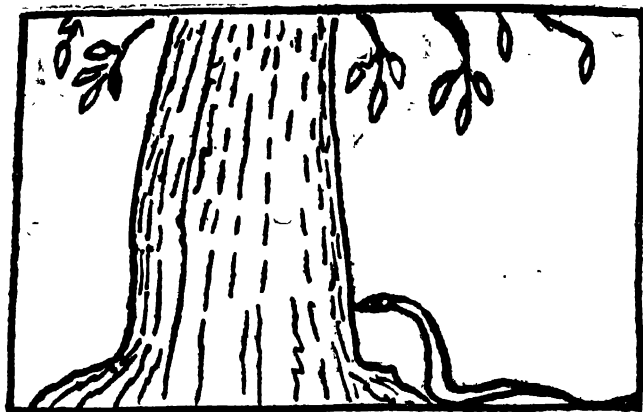
এবার একটা ন্যুড স্টাডি করা যাক—
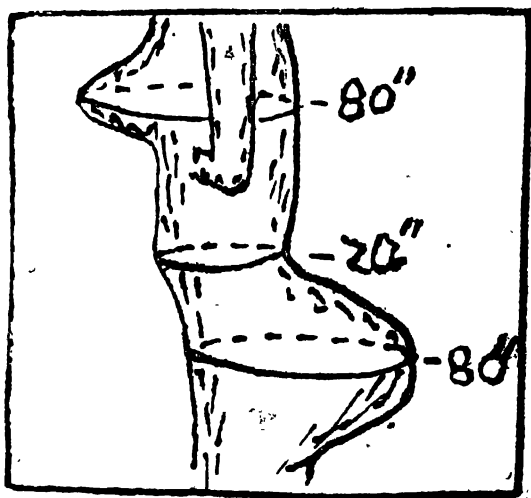
এটার নাম দেওয়া যাক "Miss World"।

মটর গাড়ীটার (কালো রঙ-এর) পাঁচ-সাত জায়গায় রঙ চটে গেছল। একটা ছোট ব্রাস নিয়ে কালো ডিলাক্স বার্নিস দিয়ে একটু একটু রঙ বুলিয়ে দেওয়া হল। ব্রাসটা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টুকরো কাগজে ব্রাসটা ঘষে ঘষে বাড়তি রঙটা তুলে ফেলে থিনারে ধুয়ে ব্রাসটা রেখে দেওয়া হল। ব্রাস-ঘষা কাগজটা এই রকম দেখতে হল—

এটাকেও তো শিল্পকর্ম বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সুধী পাঠক এর একটা caption দিয়ে দেবেন, যেমন ধরুন "কুহেলিকা" বা ওই রকম একটা কিছু। তার পর এটাকে প্রদর্শনীতে পাঠাতে পারা যায়। চাই কি, ছবিটির ভাগ্যে বাহবাও জুটতে পারে, ওই কী বলে, অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পকর্মের অপরূপ নিদর্শন হিসেবে।

হাসছেন কিংবা মুখ বিকৃত করছেন? তবে এক বিখ্যাত আধুনিক শিল্পীর কথা শুনুন। তিনি এক যুবতীর সর্বাঙ্গে কালি লাগিয়ে তাকে একটা ক্যানভাসের উপর গড়াগড়ি দিইয়ে দিলেন। এতে যে ছবি হল তা নাকি অনেক দামে বিকিয়েছিল। আর একবার তিনি একটা ক্যানভাস ফ্রেমে এঁটে তাঁর মটর গাড়ীর রেডিয়েটারের সামনে বেঁধে কাদাওয়ালা রাস্তায় গাড়ী চালান। ক্যানভাসে যে কাদার ছিটে পড়ল তাতে সেটা নাকি একখানা ভাল শিল্পকাজ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আরও শুনুন—কিছুদিন আগে একটা খবর বেরয় যে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চভ ক্রেমলিনের কাছে এক বিমূর্ত ছবির প্রদর্শনীতে গিয়ে বলেছিলেন, "গাধার ল্যাজ যদি রঙের বাটিতে ডুবিয়ে দাও, দেখবে এর থেকে ভাল ছবি সে এঁকে ফেলেছে"। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রদর্শনীটি বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দেন। তিনি বলতেন শিল্পী ও ভাস্কররা সমাজের পরগাছা। যাক, এখন সেই ক্রুশ্চভ রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজেই ছবি আঁকা আরম্ভ করেছেন।

প্যারিসে ল্যুভর গ্যালারিতে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা "মোনা লিসা" দেখেছি। দেখেছি মধুর হাসির ভাবটা—লোকে যাকে রহস্যজনক হাসি বলে। র‍্যাফেলের দু খানা "ম্যাডোনা" দেখেছি। এঁদের আরও অনেক ছবি ল্যুভর-এ দেখেছি যাতে একসঙ্গে অনেক মানুষের প্রতিকৃতি, নানা কার্যরত অবস্থায় দেখানো। বাস্তবিকই এই সব ছবি আঁকতে অনেক সময়, এমন কি, বছর লেগে গেছে। অধিকন্তু, প্রতিভাশালী ব্যক্তি (genius)

ছাড়া এ সব আঁকা সম্ভব নয়। শিল্পীর দূরপ্রসারী কল্পনা ও গভীর অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করছে এই সব ছবি। রূপায়ণও অতি চমৎকার।

তাই এঁদের আঁকা ছবির লক্ষ লক্ষ টাকা দাম হওয়া, একটু ভেবে দেখলে, কিছু আশ্চর্য নয়। যে কারণে হীরে মুক্তোর দাম অনেক, সেই একই কারণে এ সব ছবির দাম অনেক। তা ছাড়া চার-পাঁচশো বছর আগের কোনো শিল্পীর আঁকা অরিজিন্যাল ছবি অধুনা দুষ্প্রাপ্য; যদি তা পাওয়া যায় তার জন্য অনেক দাম দিতে হয়। মাটি ও পাথর ছাড়া যে কোনো পুরানো জিনিসের দাম অনেক, যত পুরানো হবে তত দাম বাড়বে। এই দেখুন না, মাত্র পাঁচ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখলে, বছরে সাড়ে ছ' টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদে (compound interest) দু'শো বছরে মোট সুদ হয় ১৫ লাখ টাকা; তিন শো বছরে ৮৩ কোটি টাকা। আর চার শো বছরে হবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা; এটা সংখ্যায় লিখলে এই রকম দাঁড়ায়—৪৫,০০০, ০০,০০,০০০ টাকা। [ভাবছি, স্টেট ব্যাঙ্কে পাঁচ টাকা, চার শো বছরের জন্য জমা দেব আর চুক্তি করিয়ে নেব যে, চার শো বছর পরে এর সুদের টাকা ক্যালকাটা, মাদ্রাজ, বোম্বে ও দিল্লী ইউনিভারসিটিতে সমান ভাগে আমার নামে দান করে দেবে। এক একটা ইউনিভারসিটি প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা পাবে। উইলও সে ভাবে একটা করব।] অতএব চার-পাঁচশো বছর আগের আঁকা ছবির দাম লাখ লাখ টাকা হওয়ায় আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

ক্যামেরা আবিষ্কারের পর প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, হাট-বাজারের বা সভাসমিতির ছবি হাতে আঁকবার দরকার কি? ক্যামেরায় এ সব ছবি নিখুঁতভাবে তোলা যায়; মুখের ভাব, দেহসৌষ্ঠব, ভঙ্গিমা একেবারে যা স্বাভাবিক ঠিক সেই রকমই তোলা যায়। এ জিনিস হাতে আঁকতে কত অনুশীলন, কত সময় ব্যয় করতে হয়। অতএব এখন ক্যামেরার যুগে এর দরকার কি? এ তো অপব্যয়! অবসর বিনোদনের জন্যে কেউ যদি এ সব ছবি আঁকেন বা তাঁর খেয়ালমাফিক যা ইচ্ছে তাই আঁকেন তো অন্য কথা।

কিন্তু চিত্রশিল্পীর দরকার আছে। দেওয়ালের ছবি, কোনো পাত্রের উপর ছবি, নক্সা, কমিক, ঐতিহাসিক কাহিনীর ছবি, বইয়ের ছবি, কাগজে বিজ্ঞাপনের ছবি ইত্যাদির জন্য চিত্রশিল্পীর প্রয়োজন; যে ছবি ক্যামেরায় তোলা যায় তা হাতে আঁকবার দরকার নেই। যে-কালে ক্যামেরা ছিল না, সে কালের কথা আলাদা।

তা হ'লে বিবেচনা করে দেখুন, কী ধরনের চিত্রশিল্প চিত্র-প্রদর্শনীতে থাকা উচিত।

যাক, শেষ করবার আগে আমার নিজের কথাটা বলি। যে ছ'খানা ছবি আমি আঁকলুম এগুলো কি হাজার দশেক টাকায় বিক্রী হয় না? আপনারা হয়ত বলবেন, হ্যাঁ, হবে, যদি পিকাসোর রেকমেণ্ডেশান করিয়ে আনতে পারেন।

হোমিওপ্যাথি, ফলিতজ্যোতিষ ও ভূতদেখা

হোমিওপ্যাথির কথা উঠলে অ্যালোপ্যাথির ও কবিরাজীর কথা এসে যায়। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার ও ওষুধে পৃথিবী ছেয়ে আছে। অ্যালোপ্যাথি বিজ্ঞানভিত্তিক। এর গবেষণায় সমস্ত উন্নত দেশে হাজার হাজার লোক কাজ করছে; লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। নিন্দুকেরা বলে, হোমিওপ্যাথি কাল্পনিক বিজ্ঞানভিত্তিক—অর্থাৎ যদি দুই আর দুইয়ে চার হয় তবে এ বাড়ীর মাপ, তার পাশের বাড়ীর মাপের সমান হবে, যেহেতু বাড়ী দুটো পাশাপাশি। হোমিওপ্যাথিতে গবেষণা সামান্যই হয়। কিছু ডাক্তার অবশ্য গবেষণা করেন, কিন্তু কি করেন তাঁরাই জানেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধ যদি সত্যিই কার্যকরী হত তবে পৃথিবীময় অ্যালোপ্যাথি ওষুধের মত এর প্রচলন হত; বিশেষত এ ওষুধ যখন অ্যালোপ্যাথি ওষুধের চেয়ে ঢের সস্তা।

আমাদের ভারতবর্ষে কটা হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতাল আছে? যদি বা থাকে তা অ্যালোপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতালের তুলনায় নগণ্য। অবশ্য সরকারী ঔদাসীন্য এর একটা কারণ হতে পারে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা এই কারণই দেখান; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার অ্যালোপ্যাথির বেলায় কেন উদারহস্ত, আর হোমিওপ্যাথির বেলায়ই বা কেন হাত গুটিয়ে নেন? কারণটা ভেবে দেখবার মতো। যদি সমাজের

প্রচলিত মূল্যবোধের জন্য অ্যালোপ্যাথির প্রতি এই গুরুত্ব আরোপিত হয়ে থাকে তা হলে প্রশ্ন উঠবে, হোমিওপ্যাথি নিজের অনুকূলে এই গুরুত্ব অর্জন করতে পারে নি কেন ?

পৃথিবীর সব দেশে এই একই অবস্থা। বলতে খুবই ইচ্ছে হয় যে, অ্যালোপ্যাথি যেন বৃহৎ কারখানা আর হোমিওপ্যাথি কুটিরশিল্প। কিন্তু তা বলতে পারা যায় কই ?

কবিরাজী আমাদের ভারতের জিনিস। পুরাকালে মনীষীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় যা বার করেছেন, আমরা এখন তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছি। মনে হয়, গত পাঁচশো বছরে এ বিদ্যার আর কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। তা সত্ত্বেও একশো বছর আগেও আয়ুর্বেদীয় ওষুধের গুণ ভারতবর্ষে পুরোপুরি স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এখন পৃথিবীময় অ্যালোপ্যাথির এত উন্নতি হয়েছে, এত রকমের কার্যকরী নতুন জোরাল ওষুধ বেরিয়েছে যে, মানুষের আয়ু ২০ বছর বেড়ে গেছে। আমরা খুব উৎসাহিত হই ও গর্ব বোধ করি যখন পাশ্চাত্ত্য দেশে কোনো আয়ুর্বেদীয় ওষুধ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরী করে বাজারে ছাড়া হয়। আয়ুর্বেদীয় ওষুধের গবেষণা যদি জোর কদমে চালানো যায় তবে তার সুফল আখেরে অ্যালোপ্যাথিই সব গ্রহণ করে নেবে—অর্থাৎ দুটো একই হয়ে যাবে, কেবল চিকিৎসাপ্রণালীর হয়তো হেরফের থাকবে।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে একটা নিয়ম চালু দেখা যায়। শিশুদের সামান্য অসুখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হয়। আর বড়দের যে রোগ অ্যালোপ্যাথিতে সারে না, সেই রোগে

হোমিওপ্যাথির প্রচলন আছে। এটা বেশ ভাল নিয়ম। বেশীর ভাগ রোগই ওষুধ না দিলেও সারে, আমরা কেবল ধড়ফড় করি, অপেক্ষা করতে চাই না। দেহের রক্তমাংস, শিরা, পেশী, সব সময়ে কোনো অস্বাভাবিক কিছু শরীরে ঘটলে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিক করে দেবার চেষ্টা করে। শরীর-বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা এর প্রমাণ পেয়েছেন। সাধারণ লোকও এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত প্রাকৃতিক চিকিৎসা বা Nature Cure-এর আদর্শ এই বিশ্বাসের উপরেই গড়ে উঠেছে। দেহের নিজেরই সচরাচর স্বাভাবিক আরোগ্য-ক্ষমতা (recuperative power) থাকে, আমরা কখনও কখনও সেই আরোগ্যের কৃতিত্ব ভুল করে ওষুধের উপর চাপাই।

আর একটা কথা—অত্যুৎসাহী ডাক্তারের (অ্যালোপ্যাথি) পাল্লায় পড়ে হয়ত গাদা গাদা ওষুধ ও হয়তো বেশ জোরাল ওষুধই শরীরে ঢুকেছে। সে ক্ষেত্রে সমস্ত ওষুধ বন্ধ করলে বা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

এ সম্বন্ধে রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' পড়ে দেখবেন।

* * * *

জ্যোতিষীরা জন্মক্ষণ ও জন্মস্থান বিচার করে ভবিষ্যৎ বলে দেন। কেউ আবার হাতের রেখা দেখে, মুখ দেখে বা কোন ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করেও ভবিষ্যৎ বলে দেন। দেশের অবস্থার ভবিষ্যৎও কেউ কেউ বলেন। তাঁরা যখন বলেন,

সময় খারাপ যাবে, তখন বলেন গ্রহশান্তির জন্য হোম করতে অথবা মাদুলী, কবচ, নীলা, পলা ধারণ করতে, তাতে দোষ কেটে যাবে।

প্রায় ৪৫ বছর আগে কাশীতে ৪ বছর বাস করার সময়ে সর্বসমেত ছ'জন বিভিন্ন জ্যোতিষীর কাছে ও ভৃগুসংহিতা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি। শৈশবে আমার মাতামহ বেশ লম্বা হলদে কাগজের রোলে আমার কোষ্ঠী করিয়েছিলেন; সেটাও তাঁদের দেখাই। এঁদের কাছ থেকে যে সব ভবিষ্যদ্‌বাণী পাই, তার কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার মিল ছিল না। পরের ৪৫ বছরের জীবনে দেখেছি কোনোটা তিন ভাগের এক ভাগও মেলে নি, বেশীর ভাগই ভুল। অনেকে বলবেন, জন্মক্ষণ ঠিক করে নেওয়া হয়নি সে জন্যে মিলছে না। কিন্তু একই জন্মক্ষণ থেকে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ভবিষ্যৎ বলেন কেন? এ ব্যাপার পাঠকরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, দেশে তো জ্যোতিষীর অভাব নেই। তবে সাবধান, অনেক সময় জ্যোতিষীর ভাষা—হয় পুত্র, নয় কন্যা, নয় গর্ভপাত—এই ধরনের হয়।

অনেকে পাঁচটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর যদি দুটো মেলে তো সেই দুটো নিয়ে খুব হৈ হৈ করেন, বাকি তিনটে যে মিলল না, তার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। পাঁচটার পাঁচটাই যদি মেলে তবেই তো তা নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। সেরকম নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষী কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। না হলে তো, আমি আপনিই যে কোনো লোকের ভবিষ্যৎ বলে

দিতে পারি, যার পাঁচটার মধ্যে দুটো মিলবেই। কেবল ভবিষ্যদ্‌বাণী বলার কায়দা ও ভাষাটা একটু আয়ত্ত করে নিতে হবে, এই যা।

এ সম্বন্ধে অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ('ফলিত জ্যোতিষ') ও রাজশেখর বসু মহাশয় ('বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি') লিখে গেছেন।

এ সব সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী ও লাখে-একজন পাশ্চাত্ত্যবাসী ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। হয়তো তাঁরা ঠিকই করেন। ভাগ্য ও জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত কোনো কোনো মানুষকে ফলিত জ্যোতিষ সান্ত্বনা ও শান্তি দেয়। সেই কারণে তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা বা তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।

তবে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা বা অনুশীলন যদি করতে হয় তবে তা Indian Statistical Institute-এর করা উচিত। তাঁরা যদি এ ভার নেন তবেই কিছু কাজের কাজ হবে।

আমাদের দেশীয় পঞ্জিকা দীর্ঘকাল অবস্থানুযায়ী সংশোধন না হওয়ার দরুন পঞ্জিকার তারিখ ২৩ দিন এগিয়ে গেছে ও সেই অনুসারে তিথিনক্ষত্র রাশিচক্র ইত্যাদি পাল্টে গেছে। ফলে, চলতি পঞ্জিকামতে ভাগ্যগণনায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সেই জন্যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসৃটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট কয়েক হাজার মানুষের, নবনির্মিত জাতীয় পঞ্জিকা (রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ) অনুযায়ী জন্মক্ষণ, তিথিনক্ষত্র, জন্মস্থান ইত্যাদির তালিকা ও সেই সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের শিশুকাল থেকে মৃত্যুদিন অবধি জীবনের গতিবিধির

পরিসংখ্যান তৈরী করা আরম্ভ করুন। আর, পরীক্ষা করে দেখুন যে জন্মক্ষণ তিথিনক্ষত্র ইত্যাদির সঙ্গে ভাগ্যের যোগসূত্র আছে কিনা। যদি তা পাওয়া যায় তাহলে ৭০।৮০ বছরের ভেতরে তাঁরা ভৃগুসংহিতার মত 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট সংহিতা' প্রণয়ন করতে পারবেন। তারপর থেকে এই সংহিতা অনুযায়ী ভারতবাসীদের ভাগ্য গণনা করা যেতে পারবে এবং তা নির্ভরযোগ্য হবে। সেইটাই হবে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য ফলিত জ্যোতিষ। ভাবী জেনারেশনের উপকারের জন্যে ৭০।৮০ বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। আর, তারা যদি কোন যোগসূত্র না পান তবে ফলিত জ্যোতিষের অপমৃত্যু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

* * * *

কয়েক দশক আগে অবধি পৃথিবীতে সমস্ত দেশে অনেক ভূত বাস করত, শহরে গ্রামে বিস্তর ভূতুড়ে বাড়ী ছিল ও ভূতেদের দেখা পাওয়া যেত। তার প্রমাণ পাই নানা বইয়ে, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের Hindu Spiritual Magazine-এ, London Psychic Society-র বিবরণীতে। উৎসাহী পাঠক কোনো পাঠাগারে গিয়ে এ সম্বন্ধে দিশী-বিদেশী বই পড়ে দেখতে পারেন। প্ল্যান্‌চেট্‌ বিষয়ের বইও পড়ে দেখতে পারেন। এ সবে অনেক লোক নিজের চোখে ভূত দেখেছে, অনেকে ভূতের সঙ্গে কথা বলেছে, ইত্যাদি ধরনের নানা লোমহর্ষক [illegible]ী পাবেন এবং এ সব যে আজগুবি নয় তা প্রমাণ করবার [illegible] খুব দায়িত্বওয়ালা লোকেদের নাম দেওয়া আছে, দেখতে

তবেঃ
জ্যোতিষ
তো, অ

পাবেন। মজা হচ্ছে, আজকাল আর কেউ, দিশী অথবা বিদেশী লোক, 'সত্যি' ভূতের কাহিনী লেখেন না। বুজরুকী ধরা পড়ে যাওয়ায় আমরা এক ধরনের 'সত্যি' ও লোমহর্ষক গল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

যা হোক, ভূতেরা এখন আর শহরে বাস করে না, তারা বাস করছে অশিক্ষিত অধিবাসীদের অঞ্চলে। ভূতের বাস্তবে বাস করার অসুবিধা থাকলে কল্পনায় বাস করার তো কোনো অসুবিধা নেই, সুতরাং ভূত এখন সবটাই কল্পনায় চালান হয়েছে। কিন্তু তার খবরও পাওয়া যায় না ; কেন না, খবর পেলেই বিজ্ঞানীরা সেখানে গিয়ে পড়বেন, আর ভূত যে সত্যি ভূত নয়, তা দেখিয়ে দেবেন। মনে হয়, অশিক্ষিত অধিবাসীরা ভূতশূন্য জায়গায় বাস করতে পছন্দ করে না। ভয় পাওয়াতেই তাদের আনন্দ!

প্ল্যানচেট্ সম্বন্ধেও আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, তার গবেষণা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। ভূতেদের সঙ্গে প্ল্যানচেটে-আসা-মানুষের আত্মারাও অদৃশ্য বা অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

যুক্তিবাদী জগৎ ছাড়া অনুভূতি ও বিশ্বাসের জগতও আছে। এই অনুভূতি ও বিশ্বাসে যদি কেউ মনে শান্তি পায়, তবে বলবার কিছু নেই, বাধা দেবারও কিছু নেই।

অলৌকিক

নির্মলবাবু এসে বললেন, সিদ্ধার্থ মহারাজের নাম শুনেছেন ?

জিজ্ঞাসা করলুম, কে তিনি ?

খুব বড় একজন সাধু। হরিদ্বারের কাছে এক আশ্রমে থাকেন। বিস্তর শিষ্য, বিস্তর লোকজন রোজ আসে তাঁর কাছে। ইনি অনেক অলৌকিক ব্যাপার করেন।

আচ্ছা ?

হ্যাঁ। শুনুন না, এক সাহেব আমেরিকা থেকে এসেছে—মাল্টি-মিলিয়নেয়ার—সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা এয়ার-কণ্ডিসাণ্ড স্টেশন-ওয়াগনে করে। ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারে সিদ্ধার্থ মহারাজের কাছে হাজির। এক শিষ্য মারফৎ ওঁর সঙ্গে কথা হল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মহারাজ বললেন, সাহেব, তোমাকে কী একটা জিনিস দেব, বল। সাহেব চুপ করে রইল দেখে তিনি বললেন, আচ্ছা একটা রিস্ট্ওয়াচ নাও। বলেই ডান হাত উঁচু করে, কোন জিনিস ধরবার মত করে হাত মুঠো করলেন। তারপর হাত নামিয়ে সাহেবের হাতে দিলেন একটা রিস্ট্ওয়াচ।

সাহেব তো অবাক। জিজ্ঞাসা করল, এটা কোথা থেকে এল ? মহারাজ বললেন, হনলুলু থেকে। সাহেব ত হতবাক্। তার মুখের ভাব দেখে মহারাজ বললেন, আচ্ছা এই নাও। বলে আবার ডান হাত ওপরে তুলে, হাত মুঠো করে নামিয়ে সাহেবের হাতে একটা কাগজ দিলেন।

সাহেব কাগজটা নিয়ে দেখল হনলুলুর একটা ঘড়ির দোকানের ক্যাশমেমো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সাহেব মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিল। স্টেশন-ওয়াগনে ফিরেই ঠিক করল, তখনই হনলুলুতে গিয়ে সেই দোকানে খবর নেবে।

সাহেব প্লেনে হনলুলু পৌঁছে খুঁজে-পেতে সেই দোকানে হাজির হল। দোকানদারকে ক্যাশমেমো ও ঘড়ি দেখাতে সে বললে, হ্যাঁ, একজন বিদেশীকে ৩০ ডলারে সে ওই ঘড়ি বিক্রী করেছে। বিদেশীর হলদে রংয়ের এক ধরনের পোশাক ছিল। আর বিদেশীর চেহারার যা বর্ণনা সে দিল তা ঠিক মহারাজের চেহারার সঙ্গে মিলে গেল।

তবেই বুঝুন, নির্মলবাবু বললেন, কী অলৌকিক কাণ্ড!

আমি বললুম, সব গাঁজাখুরি।

নির্মলবাবু থমকে গিয়ে চোখ বড় বড় করলেন, মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারপর বললেন, এ্যাঁ, গাঁজাখুরি! একটু থেমে বললেন, মশায়, আপনি নাস্তিক, অধার্মিক, মহাপাপী।

বললুম, গাঁজাখুরি। তার কারণ, প্রথমত, সেই আমেরিকান মাল্টি-মিলিয়নেয়ার, যে কোটি কোটি টাকার মালিক সে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা তখনই আমেরিকায় তার দেশবাসীকে টেলিফোন করে জানাল না কেন? কেন একদল জ্ঞানী-বিজ্ঞানী লোক নিয়ে হরিদ্বারে এসে এই অলৌকিক কাণ্ডের মর্মভেদ করল না?

একটা ঘড়ি এক জায়গা থেকে অন্য আর এক জায়গায়

পাঠাতে হলে কত হাঙ্গাম করতে হয়। ঘড়ি ভাল করে প্যাক করতে হবে, পোস্টাফিসে দিতে হবে, সেখান থেকে ভ্যানে করে রেলস্টেশনে বা এরোড্রোমে পাঠাতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে আবার ভ্যানে করে পোস্টাফিস। তারপর পিওন মারফৎ যার জন্যে ঘড়ি, সে পাবে। এতগুলো কাজ এক নিমেষে হয়ে গেল!

সমস্ত অগ্রগামী দেশ একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের সূত্র পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, কত শীঘ্র সেই আবিষ্কারকে কার্যকরী করতে পারে। তা কি হয়েছে?

দ্বিতীয়ত, মহারাজ যে ভাবে সাহেবকে ঘড়ি দিলেন, মেমো দিলেন, সে ভাবে আরও অনেক লোককে অনেক রকম জিনিস অনেকদিন ধরে নিশ্চয় দিয়ে আসছেন; অথবা, এই ধরনের অলৌকিক ব্যাপার করে আসছেন। বিস্তর লোকের এ সব আশ্চর্য কাণ্ড জানবার কথা। সেই কারণে খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরও জানবার কথা। অতএব, এটা আশা করা অন্যায় নয় যে, এত বড় একটা মহা-রহস্যজনক ঘটনা পৃথিবীর সমস্ত দেশের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় হেডলাইনে ছাপা হয়ে বেরুবে। কিন্তু এ খবর আমার চোখে পড়ে নি, কারুর চোখে পড়েছে বলে শুনিও নি।

তৃতীয়ত, জগতে অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু নেই, সব ঘটনাই প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে যতক্ষণ না আমাদের জ্ঞান হয় ততক্ষণ সেগুলিকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক বলে মনে হয় মাত্র। যেমন ধরুন, একশ বছর

আগে খুব জোরে কথা বললে বড়জোর কেবল পাড়ার লোকেরাই শুনতে পেত, একটু দূরের লোক আর শুনতে পেত না। আর এখন টেলিফোনের মারফৎ সাধারণ ভাবে কথা বললে পাঁচহাজার মাইল দূরের লোকও শুনতে পাবে এবং তার সঙ্গে বেশ কথাবার্তাও চলতে পারবে, যেন সে পাশেই একটু আড়ালে বসে আছে। এ সব ব্যাপারকে আর অলৌকিক মনে করা হয় না। মানুষ কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা করে জ্ঞানলাভ করেছে ও তা কাজে লাগিয়েছে। মহারাজের ঘড়ি আনাটা কোন্ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে হল তা গবেষণার বিষয়। একে গুপ্ত করে রাখবার অর্থ হয় না। জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ানোর জন্যে এর প্রচার হওয়া দরকার। গুপ্তবিদ্যা ও তার মহিমা অনুন্নত লোকদের মধ্যেই চালু আছে।

যাক; তবুও কেউ কেউ বলবেন, হনলুলু থেকে ঘড়ি আনা যা সিদ্ধার্থ মহারাজ করেছেন, তা সম্ভব। এর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। কি ভাবে, না, বিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, পাঁচ বছর দুপুরবেলা একঘণ্টা করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, দশবছর মৌনব্রত পালন করতে হবে, ইত্যাদি। আর আমি বলব, যে পঁচিশ ফুট হাইজাম্প করতে পারে সে যে কোনো অলৌকিক ক্রিয়া করতে পারে।

তার মানে, মানুষের অসাধ্য প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে নিজের যুক্তির সার্থকতা প্রমাণ করা। তাই বলেছিলুম, সব গাঁজাখুরি। নির্মলবাবু আমার কথা শুনে রেগেমেগে উঠে চলে গেলেন।

মনে হয় নির্মলবাবু যা বলতে চেয়েছেন তা এই—

এই স্থূল পৃথিবীটাই একমাত্র জগত নয়, অন্য সূক্ষ্ম জগতও রয়েছে, যেমন প্রাণ ও মনের জগৎ। এসব জগৎ থেকে শক্তি সংগ্রহ করা যায়।

বাহিরের জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন নানা বই ও উপায় আছে, ভেতরের জ্ঞান সম্বন্ধেও সে রকম বই আছে, পদ্ধতি ও নিয়ম আছে। সে সব হল যোগের পদ্ধতি এবং যোগলব্ধ জ্ঞান। আমাদের মাটির পৃথিবীতে যা ঘটে, ঊর্ধ্বে অদৃশ্য জগতে তা অনেক আগেই ঘটে থাকে। যারা এই ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তারা সহজে বলতে পারে কোথায় কি ঘটছে বা ঘটবে। তারাই হয় সর্বজ্ঞ। তা ছাড়া, এমন কাজ নেই যা তারা না করতে পারে, যেমন পুরাকালে আমাদের মুনিঋষিরা করতেন।

কিম্বা হয়তো আরও অনেক কাল পরে যখন মানুষ উন্নতি করতে করতে অতিমানবের পর্যায়ে চলে যাবে ও লাভ করবে দিব্যদেহ দিব্যজীবন, যখন পৃথিবী থেকে সমস্ত অস্থিরতা, সমস্ত অশুভ অজ্ঞান মিথ্যা, এমন কি, ব্যাধি-জরা-মৃত্যু পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে তখন এসব আপাত-অলৌকিক ঘটনা আর অলৌকিক মনে হবে না, বাস্তব সত্য হয়ে উঠবে। অবশ্য, যদি না ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহারে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এখন এ ধরনের কথা ভুয়ো কথা, না, বাস্তবিক এ সবের কোন মানে আছে? না, বড় বড় কথার আড়ালে কেবল ধাপ্পাবাজী?

সিদ্ধান্তের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।

তবুও একটা কথা মনে জাগে যে, যত দিন যাচ্ছে তত আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার মানুষই ঘটাচ্ছে। যেমন ধরুন, ইলেকট্রিক আলো, একসূত্রে ফোটো, ওয়্যারলেসে কথাবার্তা বলা, র‍্যাডার, টেলিভিশান, জড়বস্তুতে প্রাণসঞ্চার ইত্যাদি—যা দেড়শো বছর আগে মানুষের ধারণার অতীত ছিল, সত্যি অলৌকিক ছিল। তাহলে ভাবুন, হয়ত এখন থেকে এক হাজার বছর পরে, হনলুলু থেকে হরিদ্বারে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘড়ি আনা, কিছু আশ্চর্য বা অলৌকিক ব্যাপার হবে না। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জ্ঞান বা কীর্তি ততটা অগ্রসর হয় নি; এখনকার কালে এই ঘড়ি আনার ব্যাপারটাকে বলব, গাঁজাখুরি।

লজিক

১। ভর্তি বাসের একজন দাঁড়ানো যাত্রীর সঙ্গে আর একজন দাঁড়ানো যাত্রীর কথাবার্তা হচ্ছে। একজন অন্যজনকে বলছে, আমরা মানুষ, হাইকোর্টের জজও মানুষ। দুজনেরই টাকার দরকার। তাঁর যদি চার হাজার টাকা মাইনে হয়, আমাদের কেন দুশ টাকা? এ অবিচার সহ্য হয় না।

২। খোকন বাড়ীর রোয়াকে আড্ডা দেয়, মাঝে মাঝে স্কুল পালায়। মা বকৃতে সে বলে উঠল, তাতে কি হয়েছে? রবিঠাকুরও স্কুল-কলেজে পড়ে পাস করে নি।

[বাপ শুনে বললেন, আর ভাবনা কি? ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয় নোবেল প্রাইজ পাবে।]

৩। পরমাণুকে ভাগ করলে যখন প্রচণ্ড শক্তি বেরয়, তখন একটা ওষুধকে ভাগ করলে (হোমিওপ্যাথি ওষুধ) সেটা থেকেও প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেবে।

[পরমাণুকে ভাগ করতে অতি বড় বৈজ্ঞানিকের পরিচালনায় অতি-জটিল ও অতি-মহার্ঘ সাইক্লোট্রন যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দরকার হয়। ওষুধ ভাগ করে (dilution) দুগ্ধশর্করা (sugar of milk) ও সুরাসার (alcohol) মিশিয়ে। হোমিও-প্যাথি ওষুধে যত সহজে dilution বাড়িয়ে জোরালো করা হয় বা তার potency বাড়ান হয় (বাড়ে কি না ভগবান জানেন!) পরমাণুকে যদি সেভাবে করা যেত তাহলে ঘরে ঘরে অ্যাটম বোমা তৈরী হত। নিন্দুকেরা হয়ত বলবেন কয়েকজন

হোমিওপ্যাথকে অ্যাটমিক রিসার্চ-ইন্‌স্টিটিউটে রাখলে কত সহজে ও কত সস্তায় পরমাণু থেকে শক্তি বার করিয়ে কলকারখানা চালান যেত !]

৪। পাশ্চাত্ত্য মতে companionate marriage-এর যে বিয়ে হয় তা চিরস্থায়ী। কারণ companionate marriage-এ মেয়েপুরুষে জানতে পারে কে কার উপযুক্ত। প্রথমে একজনকে দিয়ে যদি সুবিধে না হয় তো আর একজনকে নিতে হবে, নয়ত তৃতীয় জনকে নিতে হবে, যতদিন না পছন্দমত স্বামী/স্ত্রী পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার পর বিয়ে হলে ডাইভোর্স হবে না।

[এ-ভাবে বিয়ের পর সারাজীবন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বা খিটিমিটি হবে না—এ আশা করা মূর্খতা। পাশ্চাত্ত্যের অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিয়ের পবিত্রতায় (sanctity) আস্থাহীনতা ও ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক সহ্যশক্তির অভাব—স্বভাবের এই সব বৈশিষ্ট্য যতদিন থাকবে ততদিন পাশ্চাত্ত্যবাসীর বিয়ের স্থায়িত্বে নিশ্চয়তা নেই, ডাইভোর্স চলতে থাকবেই।]

৫। আমার নাম ভূপেন, স্ত্রীর নাম আভা। দুজনের নামেই 'ভ' আছে। অতএব আমরা রাশিয়ান।

লটারির Paradox

আমি কখনও লটারির টিকিট কিনতুম না। লটারিতে যে টাকা পাওয়া যায়, এ মনে হত না। এত লোক টিকিট কেনে আর তার মধ্যে আমার নামই লটারিতে উঠবে, এ আশা করা যায় না।

আজকাল প্রায় সব রাজ্যে স্টেট লটারি চালু হয়েছে, ছ'তিন মাস অন্তর অন্তর হয়। এক টাকার টিকিটের প্রথম পুরস্কার ১ লাখ, ২ লাখ, ৫ লাখ পর্যন্ত আছে; এক এক স্টেট এক এক পরিমাণ দিচ্ছে। তাছাড়া ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ পুরস্কার থাকে; সব চেয়ে কম পুরস্কার হয়তো মাত্র ৫০ টাকা।

যে স্টেট ১ লাখ টাকা প্রথম পুরস্কার দেয়, সে স্টেট আরও এক হাজারটা পুরস্কার (৫০ টাকা অবধি) দেয়। সব ধরে মোট হয়ত আড়াই লাখ টাকা পুরস্কার দিতে হয়। খরচ ও যে সৎকাজের জন্য টাকা তোলা হচ্ছে, এ সব ধরে স্টেট প্রায় ১০ লাখ খানা টিকিট বিক্রী করে। প্রথম পুরস্কার ১ লাখ টাকা পেতে হলে ১০ লাখ টিকিটের মধ্যে যদি আমার নম্বরটা ওঠে, তবেই আমি টাকা পাব।

অঙ্কশাস্ত্রে একটা বিষয় আছে Mathematical Probability। তার নিয়ম অনুসারে এই লটারির একখানা টিকিট কিনলে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা ১০ লাখের এক ভাগ; দুখানা কিনলে ৫ লাখের একভাগ, ৫ খানা কিনলে ২

লাখের এক ভাগ। আর ৫০ টাকা অবধি পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা ৫ খানা টিকিট কিনলে দুশোর এক ভাগ। অর্থাৎ যদি এক হাজার খানা টিকিট কেনা যায়, তবে অন্তত ৫০ টাকার একটা পুরস্কার নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রের এ নিয়ম বিবেচনা করলে, কার এত ধৈর্য ধরে এতগুলো টাকার রিস্‌ক নিতে ইচ্ছে হয়? এত কথা কি, যেখানে দশ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা সে লটারিও কি পাওয়ার আশা করা যায়? অর্থাৎ মাত্র দশ খানা টিকিটের লটারি খেলায় একখানা টিকিট থাকলে, ধরে নিতে পারা যায় যে সে পুরস্কার পাওয়া যাবে না—তা আবার ১০ লাখে ১ সম্ভাবনায় যদি একলাখ টাকা পুরস্কারের আশা করে একখানা টিকিট কিনে থাকি, তাহলে তো পুরস্কারের সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায় পর্যবসিত হয়। এ সব হল অঙ্কের কথা, যার সার কথা হল লটারির টিকিট কেনা স্রেফ্ মূর্খতা।

কিন্তু একটা বড় 'কিন্তু' আছে। তা হল এই—এই যে 'Probability' থিওরীর কথা বলা হল, এটা প্রযোজ্য যারা প্রাইজ পায় না তাদের জন্যে; যে, ধরুন, প্রথম প্রাইজ পেল তার জন্যে নয়। তার জন্যে এ থিওরী সম্পূর্ণ অকেজো। কেন না, দেখা গেল তার সম্ভাবনা ছিল একের মধ্যে এক, ১০ লাখের এক ভাগ নয়, যদি সে একখানা টিকিট কিনে থাকে। যদি ৫ খানা টিকিট কিনে থাকে তবে ৫ এর মধ্যে এক, ২ লাখের এক ভাগ নয়। এই ভাবে এই নতুন থিওরী, ৫০ টাকার পুরস্কার যে পায়, তার সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

Probability থিওরীর গলদ্ বোঝা যায় আর একটা খবরে। খবরটা হুবহু তুলে দিলাম—

'একটি নয়, দুটি নয়; পাঁচ-পাঁচটি লটারির পুরস্কার পেয়েছেন এক ব্যক্তি। এ হেন ভাগ্যবানটি আসামের তেজ-পুরের পুলিশ রিজারভে কাজ করেন। নাম শ্রীউপেন কলিতা। এ খবর দৈনিক 'আসাম'-এর। শ্রীকলিতা ৩১ জানুয়ারী পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ লটারির তৃতীয় পুরস্কার ৩০ হাজার টাকা, ও ওড়িশা লটারীর তৃতীয় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশ লটারির ২৫ হাজার টাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারি পেয়েছেন পানজাব লটারীর তৃতীয় পুরস্কার ২০ হাজার টাকা এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারি পেয়েছেন মহীশূর লটারির দ্বিতীয় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা। মাত্র ২৮ দিনের মধ্যে লটারি থেকে তিনি পান মোট ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই মার্চ ১৯৭০।

সাধে কি আর বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল বলেছেন: 'Mathematics may be defined as the subject in which we never know what we are talking about, nor whether what we are saying is true.

মাঝখান থেকে লাভ (অথবা লোকসান) হল এই যে, এখন প্রতি মাসে আমার ৮৷১০ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে লটারির টিকিট কিনতে। এখন দুটো যুক্তি বের করেছি। এক নম্বর হল, যে টিকিট কেনে না সে নিশ্চয় প্রাইজ পাবে না। আর

দু নম্বর হল, আমার এই ৮।১০ টাকার কিছুটা তো সৎকাজে ব্যবহার হবে ও তাতে আমার পুণ্য হবে। অবশ্য একটা আশা মনের গোপন কোণে উঁকিঝুঁকি মারে, সেটা হচ্ছে যদি টক্ করে আমার টিকিটই প্রথম প্রাইজ পেয়ে যায়, আমার থিওরেম (নাম দেওয়া যাক Bose's Theorem) অনুসারে !

ভারতবাসীর চোখে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর জীবনধারা

১। পাশ্চাত্ত্য দেশ বলতে কেবল ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার কথা বলা হচ্ছে। সে সব দেশের যারা মাথা, জনসাধারণ ও কাগজের রিপোর্টাররা অনর্থক তাঁদের আকাশে তুলে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকে নাকি হাসতে ভালবাসেন, গল্‌ফ খেলতে ভালবাসেন। তিনি best dressed man এবং তাঁর অনেক সামাজিক গুণ। তাঁর স্ত্রী যখন রাজ্যের first lady তখন তিনি খুব বিদুষী ও সুন্দরী, তিনি যা পোশাক পরেন তাই হয় ফ্যাশান, তিনি মাথার চুল যেমন ভাবে আঁচড়ান সব মেয়েরা সেই রকম আঁচড়ায়। তিনিই হন মেয়েদের আদর্শ। (কেবল মিসেস কেনেডি, না না, মিসেস ওনাসিস ডুবিয়েছেন।)

২। পাশ্চাত্ত্যে বাহ্যিক ভদ্রতার মাত্রা বড় বেশী। আমরা সব সময়ে তা বুঝতে পারি না। ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সুখ্যাতি করলে আমরা ঠিক ধরতে পারি না, আমরা গলে যাই। যেমন ধরুন, এদেশীয় মানে আমার চেহারা একদম মামুলী আর পশ্চিমী মানে কুৎসিত। তা সত্ত্বেও, পশ্চিমী লোকেরা পাকে-প্রকারে আমার সুখ্যাতি করবেই; আমাকে বলবে, তোমার চোখ কি সুন্দর, তোমার চুল কি সুন্দর! আমার সস্তা দামের ক্যামেরা দেখে বলবে, what a lovely camera you have!

সেই রকম তারা আমাদের সেতার শুনতে বা নানা রকমের বাজনার সঙ্গত শুনতে টিকিট কেটে হুড়িয়ে হাজির হয়। এটা কেবল নতুনত্বের জন্যে ও মজা দেখবার জন্যে। জিজ্ঞাসা করলে বলবে, এমন চমৎকার বাজনা জীবনে শুনি নি! ওদের খবরের কাগজে প্রথম পাতায় এসবের খুব সুখ্যাতি বেরয়।

তারপর আমাদের মেয়েদের শাড়ী সম্বন্ধেও ওই একই কথা, lovely, lovely! আমাদের মেয়েরা একেবারে গলে যান, বলেন, মেমেরা আমাদের শাড়ী ভীষণ পছন্দ করে।

যদি কেউ কোনো জিনিস সত্যিই মন থেকে পছন্দ করে, তবে তার সেটা ব্যবহার করা বা চর্চা করার ইচ্ছা জাগে ও করবার চেষ্টা করে। যেমন, পশ্চিমী পুরুষের পোশাক আমাদের পছন্দ, তাই আমরা আমাদের দেশে বসে হাজার হাজার লোক কোট-প্যাণ্ট ও টাই পরি। ওদের মেয়েদের যদি শাড়ী এতই পছন্দ তো কত হাজার ব্রিটিশ, জার্মান, প্যারিসিয়ান, আমেরিকান মেয়ে তাদের নিজেদের দেশে শাড়ী পরে? হ্যাঁ, পরে দু-দশ জন—যারা ভারতবাসী বিয়ে করেছে তাদের কেউ কেউ, আর পরে fancy dress উপলক্ষ্যে। বাজনার ব্যাপারেও তাই। পছন্দ বলে ভারতে অন্তত দশ হাজার এ দেশীয় লোকের পিয়োনো আছে ও তা বাজান হয়। কিন্তু কটা বাঁয়া-তবলা বা অন্য ভারতীয় বাজনা পশ্চিমদেশে আছে? নামমাত্র সংখ্যায় আছে, আর আছে হিপিদের আড্ডায়। আজকাল অবশ্য বিদেশ-সফররত ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের দৃষ্টান্তে মার্কিন মুলুকে আগের তুলনায় বেশী সংখ্যায় সেতার সরোদ ও বাঁয়া-

তবলা চালান যাচ্ছে ; কিন্তু নানা লক্ষণ দৃষ্টে এও সাময়িক হুজুগ বলে মনে হয়।

৩। ওদের চেহারা খুব সুন্দর। কোনো ভারতবাসীর ফর্সা রঙ, লম্বা-চওড়া গড়ন দেখলে আমরা বলি, 'কি সুন্দর! যেন সাহেবের মত দেখতে।' আবহাওয়া, সচ্ছল অবস্থা ও উন্নত চিকিৎসা-প্রণালীর দরুন ওদের দেহ শক্ত সমর্থ ও কর্মঠ হয় এবং ওরা দীর্ঘজীবী হয়।

৪। বলডান্সের খুব চল। পার্টি দিলেই বলডান্স হবে। শিল্পবিহীন এই নাচ যে কেন এত চলে তা বোঝা যায় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শেষ বয়সে যে old men's home-এ থাকে, এ নাচ কেবল সেখানকারই উপযুক্ত।

৫। ভারতের আদিবাসীদের মত বিস্তর পশ্চিমী মেয়ে ধূম-পান করে ও মদ খায়।

৬। পাশ্চাত্ত্য দেশের মেয়েরা দেহ ও দেহের গড়ন দেখাতে একটু বেশী ভালবাসে, পোশাকও সেইভাবে তৈরী হয় ; কেবল শীতের দেশ বলে কিছু অসুবিধে হয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে বিকিনি-পরা, মিনিকিনি-পরা ও টপ্‌লেস মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। বছরে বেশী দিন সূর্য দেখতে পায় না, তাই Sun-bathing করে। ভারতীয় উগ্র পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন মেয়েরাও সাধারণত পশ্চিমী পোষাক পরেন না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ভারতীয় মেয়েরা এমন পোশাক করাচ্ছেন যাতে পেট-পিঠ-বুক অনেকটা বেরিয়ে থাকে, তবে তাঁরা মেমেদের মত উরু দেখান না। তাঁরা সমুদ্রের ধারে যদি বা সুইমিং

কস্‌টিউম পরেন, বিকিনি-মিনিকিনি পরেন না; টপ্‌লেস একেবারে অসম্ভব।

৭। পাশ্চাত্ত্য দেশের পুরুষরা অন্য পুরুষদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে লজ্জা করে না। খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা পোশাক বদলে ইউনিফরম পরার সময়ে অন্য লোকের সামনে সহজভাবে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই পোশাক বদলায়। ট্রেনের কামরায় রাত্রে শোবার পায়জামা পরে ঠিক এই ভাবে, অবশ্য যদি কামরায় স্ত্রীলোক না থাকে। লণ্ডনের Y. M. C. A-র সুইমিং পুলে নোটিশ আছে: swimming trunk not allowed; সেখানে সকলে উলঙ্গ হয়ে স্টোরে পোশাক জমা দিয়ে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নামে। সাঁতার শেখে, সেই অবস্থায় স্টোরে যায়, তোয়ালে দিয়ে গা মোছে, তারপর পোশাক পরে বেরিয়ে যায়। ৫০।৬০ জন সাদা ধবধবে উলঙ্গ লোকের ঘোরাফেরা ও সাঁতার দেওয়া ভারতবাসীদের তাজ্জব বানিয়ে দেয়। এ সব ব্যাপারে স্ত্রীজাতিরাও নাকি এই রকমই করে।

৮। নৈতিক চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা ঢিলেঢালা। স্ত্রী ছেড়ে স্ত্রী নেওয়া, স্বামী ছেড়ে স্বামী নেওয়া সহজ ব্যাপার। Pre-marital sex-relation ও extra-marital sex-relation কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। বিয়ের সময়ে প্রতি দশটি কনের তিনটি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় থাকে।

৯। পাশ্চাত্ত্য দেশের কিছু কিছু ভদ্র ঘরের মেয়ে আর্টিস্ট-এর মডেল হওয়া একটা পেশা মনে করে। মডেল হলে কি

করতে হয়, যার জন্য তারা মাহিনা পায়, এটা যদি কেউ না জানেন ত কোনো আর্টিস্টকে জিজ্ঞাসা করবেন। এটা অবশ্যই ঠিক যে এ পেশায় ব্যাভিচারের নামগন্ধ নেই, ক্বচিৎ কখনও আর্টিস্টের অসংযমের দরুন ব্যাভিচারের ঘটনা ঘটে ; তবু আজো ভারতের কোনো ভদ্র পরিবারের মেয়ে এ পেশার কথা ভাবতে পারে না।

১০। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে ন্যুডিষ্ট কলোনী আছে। এগুলি বৃহৎ কম্পাউণ্ডওয়ালা উঁচু পাঁচিল-ঘেরা হোটেলের মত। এখানে জন্মের সময়ে স্ত্রীপুরুষ যে ভাবে পৃথিবীতে এসেছে সেই ভাবে যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা থাকেন। সেই ভাবে এক সঙ্গে চলাফেরা, গল্পকরা, খাওয়া-দাওয়া, স্নান করা, গান করা, নাচা, মিটিং করা—সবই করেন। শোয়া আলাদা আলাদা ঘরে। গ্রীষ্মকালে ছুটি কাটাবার জন্য ও বিশ্রাম নেবার জন্য এ কলোনীগুলিতে ভীড় হয়। কলোনীর বাইরে যেতে হলে পোশাক পরে বের হতে হয়, নয়তো আইন-ভঙ্গ অপরাধ হয়। এখানে থাকতে হলে এখানকার মেম্বার হতে হবে। বাইরের লোকের মজা দেখবার জন্য এই কলোনীতে প্রবেশ নিষেধ। যারা back to nature-এ বিশ্বাসী ও মেম্বার হতে রাজী তারাই খরচা দিয়ে এখানে ভর্তি হতে পারে। ভর্তি হয়েই পোশাক-আশাক সব খুলে রাখতে হবে, এবং কলোনীর কড়া নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানকার বাসিন্দাদের ধারণা যে, এভাবে স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে মেলামেশায় নৈতিক উন্নতি হয়। আর প্রতি অঙ্গে সমস্ত

ক্ষণ স্বাভাবিক আলো-হাওয়ার প্রতিফলনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

১১। পাশ্চাত্ত্য দেশে ছেলে বিয়ে করলে বাপ-মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকবেই। বাপ-মার সঙ্গে বা নিজের অন্য বিবাহিত ভাইবোনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমে যেতে থাকে, পরে হয়তো বছরে একবার ক্রীস্টমাস কার্ড পাঠিয়ে যৎসামান্য যোগা-যোগ রাখে। ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নীদের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগ থাকে না। এর দরুন যে এরা বৃদ্ধ বয়সে একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তা ঠিক বলা যায় না। সময় কাটাবার জন্যে বাগান বা পোল্ট্রি ফার্ম করে, ঘরদোর আসবাবপত্র মেরামত ও রং করে, নানান্ জনহিতকর ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মেম্বার হয়, মিটিং-এ যোগ দেয়, পার্টিতে যোগ দেয়, নিজেরাও কখন কখন ছোটখাট পার্টি দেয়, অথবা যা-হক-একটা 'হবি' নিয়ে থাকে ; তা ছাড়া, নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে টেলিভিশান আছে। মাঝে মাঝে হয়তো ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের দু'চার দিনের জন্যে কাছে এনে রাখে। শারীরিক দুর্বলতার জন্যে দরকার হলে পরিচারিকা রাখে। এরা যে অসুখী তা বলা যায় না।

তবে যারা গরীব, যারা থাকবার আস্তানা গড়ে তুলতে পারে নি, তাদের দুর্গতি হয় ও তারা বৃদ্ধদের 'হোমে' অন্য আরও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে বাস করে, কম খরচে বা নিখরচায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে গরীবের সংখ্যা কম বলে 'হোম'বাসীর সংখ্যাও কম ; দেশের ১০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে হয়তো মাত্র ৫ জন 'হোমে' থাকে।

ও দেশে খবরের কাগজে প্রায়ই উকিল-এটর্নিরা বিজ্ঞাপন দেয় যে, অমুক লোক মারা গেছে, তার সম্পত্তি আছে, কোথাও কেউ যদি তার উত্তরাধিকারী থাকে তো সে বা তারা যেন জানায়। এটা হওয়ার কারণ এই যে, ওখানে কেউ নিজের আত্মীয়স্বজনের খবর রাখে না, চিরকাল কেবল আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

১২। পাশ্চাত্ত্য দেশে অর্থই পরমার্থ। ওরা অর্থটা খুব ভাল করে চেনে। বাল্যকাল থেকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলকে বুঝিয়ে দেয় অর্থের কী মূল্য ও অর্থ কত দরকারী। প্রতি লোক বাল্যকাল থেকেই money conscious হয়। বাপ-মা ছেলের বাড়ীতে দু-চার দিনের জন্যে থাকলেও খরচা দেয়, ছেলেও নেয়।

আমাদের দেশে প্রতি মাসের প্রথমে পোস্টাফিসে ভীড় হয়, চাক্‌রে লোকেরা মাইনে পেয়ে দেশে আত্মীয়স্বজনদের মনি-অর্ডারে টাকা পাঠায়। ওখানে এইরকম কেউ টাকা পাঠায় না, মাসের প্রথমে অথবা সপ্তাহ-শেষে মাইনে পাবার দিনে পোস্টাফিসে ভীড়ও হয় না।

১৩। পাশ্চাত্ত্য দেশে সাধারণত লোকেরা দান করে না, দান নেয়ও না। ওরা মনে করে কারুকে দান করলে তার মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয়। ও দেশে ভিক্ষাবৃত্তি বে-আইনী, যদিও কিছু কিছু ভিক্ষুক দেখা যায়।

তবে ওখানকার বড়লোকেরা বড় বড় দান করেন। টাকা যখন উপ্‌চে পড়ে, তার দ্বারা নিজের যা সুখসুবিধে তা পুরো

পেয়ে যান, তখন সেই উপচে-পড়া টাকা দান করেন। আর যাঁদের উত্তরাধিকারী নেই, টাকা থাকলে তাঁরাও দান করে যান। দান করা হয় কোনো সমাজকল্যাণকর কাজে, যেমন হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে বা দেশ-বিদেশের দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানে।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্তরের লোকদের দান করবার একটা স্পৃহা আছে, দান করলে পুণ্য হয় মনে করে। আর দান গ্রহণের লোকও আছে।

১৪। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভেজাল বা নকল জিনিসের চল নেই। জলমেশানো বা মাখনতোলা 'খাঁটি' দুধ, ভেজাল দেওয়া বা জলো মাখন ইত্যাদি রকমের কোনো জিনিস বিক্রী হয় না। ভেজাল ওষুধ পাওয়া যায় না। যে জিনিসই তৈরী হয় তা খাঁটি ও high quality-র। বাড়ী বাড়ী গিয়ে খালি টিনের কৌটো, খালি ওষুধের শিশি, খালি তেলের বোতল কেউ কেনে না। সে জন্যে ভেজাল জিনিস ভরে আসল বলে বিক্রীর প্রশ্নই নেই। ভেজাল জিনিস ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি হয়, ৩৩ বছর জেল হওয়ার শাস্তিরও নজির আছে। মোটের উপর বলা যায়, ঠকানোর কারবার নেই। সে জন্যে জিনিস তৈরীর মান খুব উন্নত।

জড়বাদী দেশের এই নীতির মান কিন্তু আমাদের দেশে মোটেই অনুসৃত হয় না। অথচ আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক দেশ বলে কতই না নামডাক! মুখে ধর্মের বুলি একটু কম আওড়ালেই বোধ হয় ভাল।

১৫। ওরা নিজের দেশের কি করে ভাল হয়, সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। দেশের মন্দ করে আত্মীয়স্বজনের ভাল করবার চেষ্টা করে না ; দেশের স্বার্থ আগে, আত্মীয়স্বজনের স্বার্থ পরে।

১৬। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যন্ত্রপ্রধান সভ্যতা। কর্তব্যপালনে সদা তৎপর। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক আচার নিয়ে ভারতবাসীদের মত অত মাথা ঘামায় না।

১৭। পাশ্চাত্ত্য সব দেশে বিস্তর ইহুদি আছে। ওরা সাতেও নেই পাঁচেও নেই, যে দেশে বাস করে সে দেশ নিয়ে মাথা ঘামায় না, দেশের অন্য অধিবাসীদের সঙ্গে মেশে না, কেবল নিজেদের ব্যবসা নিয়ে থাকে। কিছু ব্যতিক্রম আছে। কয়েকজন ইহুদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টে চাকরি করে নাম করেছেন। ভারত-বর্ষের এককালীন ভাইস্‌রয় লর্ড রীডিং জাতিতে ইহুদি ছিলেন।

১৮। ইংরেজদের মতে জার্মানরা গোঁয়ার, ফরাসীরা শিথিল-চরিত্র আর আমেরিকানরা নাক-উঁচু জাত। বাকী পাশ্চাত্ত্য জাতকে নিয়ে, এমন কি রাশিয়ানদের নিয়েও তত মাথা ঘামায় না। অন্য দেশের লোকেরা ইংরেজদের মনে করে অতিরিক্ত রক্ষণশীল, কেউ মনে করে ব্যবসাদার জাত, আবার কেউ তাদের বলে hypocrite। টাকার জোরের জন্যে আমেরিকাকে সব দেশ সমীহ করে।

১৯। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের ধারণা পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের অনেক দোষ আছে, তারা ভারতবাসীদের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নয়, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শত দোষ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্যে বিস্তর বিশ্ববিখ্যাত

শিল্পী, কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আছেন। জ্ঞানেবিজ্ঞানে তারাই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ তাঁদের চরিত্রের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁদের কর্মনিষ্ঠা। অত্যন্ত পরিশ্রমী তাঁরা। তাঁদের এই প্রশংসনীয় অভ্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপ্রীতি, সময়জ্ঞান প্রভৃতি সদ্‌গুণ।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একটা চিঠিতে পাশ্চাত্ত্যদেশ সম্বন্ধে লেখেন (চিঠিটা তিনি বাংলায় লেখেন) যে, ওদেশের দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে, তা হচ্ছে—'অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা'।

২০। পাশ্চাত্ত্য দেশ materialism-এর পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে এবং সাংসারিক সুখসুবিধা পুরোদমে ভোগ করবার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ওদেশের লোকেরা বেশ আরামে আছে। টাকা থাকলে পাশ্চাত্ত্য দেশে ওদের নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলাপ্রীতির দরুন অবশ্যই বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে ও আরামে থাকা যায়। কিন্তু মানবজীবনের সবচেয়ে কাম্য বস্তু হল শান্তি। তা কতটা পেয়েছে ওরা? ওরা যে এত মদ খায়, তা কিছুটা শান্তি পাবার জন্যে কি? পাগলের ও আত্মহত্যার সংখ্যার হিসেব নিয়ে দেখা দরকার। হিপিদের সংখ্যাই বা দিনে দিনে এত বাড়ছে কেন? স্বতঃই মনে প্রশ্ন ওঠে—কর্মযোগী-জ্ঞানযোগী পাশ্চাত্ত্যবাসীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে শান্তি পেয়েছেন কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ বইতে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ আছে, তাই তাঁর কথা একটু লিখছি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসমাধুর্য বা 'সোনার তরী'-র অর্থের সন্ধান আমি দিতে পারব না, তাঁর কাব্যে মরমীবাদ কোথায় কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তারও জহুরী আমি নই; আমি শুধু সাধারণ ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারি এবং তার কথা পাঠককে জানাতে পারি। আমি বলব 'বৈরাগ্য' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ,' 'দুই বিঘা জমি' প্রভৃতি কবিতা বড় সুন্দর; আমি বলব 'কাবুলিওয়ালা' অনবদ্য, 'প্রত্যাবর্তন' করুণ, 'নষ্টনীড়' মনস্তাত্ত্বিক, 'রাজর্ষি' ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী এবং 'গোরা' স্বাদেশিকতায় ভরা। তাঁর লেখা গান ও সুর মনে আনন্দ দেয়, তবে কখনো কখনো একঘেয়েও মনে হয়।

স্কুল ও কলেজের প্রথম দুবছর রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ি নি। মনে পড়ে 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'বৈরাগ্য' ছাড়া অন্য কোনো কবিতা জানতুম না, কোনো প্রবন্ধও বোধ হয় পড়ি নি। সেই সময়ে অর্থাৎ প্রায় ৫০।৬০ বছর আগে স্কুলে বাংলা পড়ার বিশেষ দরকার হত না, পাশ করবার জন্যেও না। তখনকার দিনে বাংলায় চিঠি লেখারও রেওয়াজ ছিল না। পরে কলেজের তৃতীয় বছরে আমাদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' বইখানা হাতে পাই। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে বইটি পড়তে বাধ্য হয়েছিলুম। হঠাৎ

আমার চোখে এক নতুন আলো এসে পড়ল। পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম—কী ভাব, কী প্রকাশভঙ্গি, কী তার বিশ্লেষণ! আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় রই যে এত উচ্চস্তরের হতে পারে তা দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। রবীন্দ্রনাথকে একজন বড় কবি বলে জানতুম, তিনি যে এমন প্রাঞ্জল প্রাণপূর্ণ গদ্যও লিখতে পারেন আগে তা জানতে পারি নি। মনে একটু আগ্রহ জাগল, এমন যাঁর গদ্য লেখা, এমন সুন্দর যাঁর প্রবন্ধ, না জানি তাঁর হাতে কাব্য কত মহৎ হবে, কত মধুর হবে। অতএব তাঁর কতকগুলি বই পড়ে দেখতে হবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের তেমন কিছু ঔৎসুক্য ছিল না। এটা অবশ্য আমার ধারণা। ৬০।৭০ বছর, কিংবা তারও অনেক আগে থেকে দেশের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে আসছিল। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেশ সমাজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। এর প্রধান কারণ মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। নতুন-গড়া ব্রাহ্মসমাজকে কলিকাতার সাধারণ লোকেরা ভাল চোখে দেখতেন না। যদিও এই বিরূপতার সংগত কোনো কারণ ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের দ্বারা তৎকালে বাংলা দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা বলতেন, রবীন্দ্রকাব্যে বড় অস্পষ্টতার

ও দুর্নীতির ছাপ আছে। তারই রেশ ৫০।৫৫ বছর আগেও ছিল। যদিও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পাবার পরে এই বাগ্‌বিতণ্ডা অনেক কমে আসে। কিন্তু তখন অনেকে মনে করতেন, এই নোবেল প্রাইজ পাবার কৃতিত্ব আসলে ডবলিউ, বি, য়েট্‌সের, যিনি ওঁর গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী তর্জমা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তৎকালপ্রচলিত রবীন্দ্র-বিমুখতার জন্যেই যে এরকম মনে করা হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা নিঃসংশয়ে বোঝা গেছে যে য়েট্‌সের ভাষা সংশোধনের কৃতিত্বের জন্যে নয়, রবীন্দ্রকাব্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নোবেল পুরস্কারের বিজয়মাল্য অর্পিত হয়েছিল।

সাহিত্যে উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি হল—ভাব ও ভাষা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাব অনন্যসাধারণ, ভাষাও তাই। তবে সে ভাষাটা ওঁর মাতৃভাষা বাংলা। নোবেল প্রাইজে মনোনীত হওয়ার জন্যে যোগ দিতে হলে ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞানবিষয়ক হলে, তা পাশ্চাত্ত্য যে কোনো ভাষায় তর্জমা করা সহজ ব্যাপার, কেননা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে এক্সপেরিমেণ্ট বা কার্যফলের বিবৃতি। জাপানী বা চীনে ভাষায় লিখলেও তা পাশ্চাত্ত্য ভাষায় তর্জমা করা খুব কঠিন নয়, তাতে বৈজ্ঞানিক ফলের কিছু ফারাক হবে না এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়াও আটকাবে না। কিন্তু সাহিত্যের বেলায় সাহিত্যিকের ভাব প্রকাশ করতে হলে

তর্জমার ভাষা ঠিকমত হওয়া দরকার এবং তার জন্যে যে ভাষায় তর্জমা করা হবে, সে ভাষা যার মাতৃভাষা এমন লোকের সাহায্য নিতে হবে। এ করলে সাহিত্যিকের বা সাহিত্যের মর্যাদার হানি হয় না। নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যে সাহিত্যিককে linguist হতেই হবে, এমন কোনো সর্ত নেই।

বিলাতের সঙ্গে রবীন্দ্র-পরিবারের সম্পর্ক অনেক দিনের, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাবার আগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তিন বার বিলাত ঘুরে এসেছিলেন। সেই সব কারণে ওঁর পক্ষে বিলাতের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সহযোগিতা পাওয়ার সুবিধা হয়েছিল। এই সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি ডবলিউ. বি. য়েট্‌স, যিনি নিজেই দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। বন্ধুভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুবই ভাগ্যবান বলা যায়। কিন্তু বন্ধুভাগ্য আর মানুষকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? জীবনে বিশিষ্টতা অর্জনের পক্ষে স্বকীয় প্রতিভাই হল আসল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রতিভা বিলক্ষণ ছিল এবং তার শক্তি নিতান্ত স্বল্প বয়সেই স্ফুরিত হয়েছিল। যে কবি মাত্র ২০।২২ বছর বয়সে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র মত গীতিনাট্য, 'ভগ্নহৃদয়'-এর মত কবিতার বই ও 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর মত উপন্যাস লিখতে পারেন, বেঁচে থাকলে তিনি যে নোবেল প্রাইজ পাবেন, এতে আর আশ্চর্য কি?

যাই হোক, এখন আর রবীন্দ্র-বিরোধী বিশেষ কেউ নেই;

দু'একজন ছাড়া সকলেই এখন রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটু বেশী রকমেই ভক্ত।

১৯২১।২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখি, জোড়াসাঁকোয় ওঁদের বাড়ীতে 'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়ে। এতে তিনিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে যখন তাঁর মুখের কথা শুনলুম, তখন তাঁর গলাটা যেন একটু সরু ও বয়সের সঙ্গে বেমানান রিণ্‌রিণে মনে হয়েছিল। এমন সুন্দর সৌম্যমূর্তি, এমন ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক পুরুষ, তাঁর কণ্ঠস্বর এমন মিহি ও মোলায়েম ধরনের কেন, তাই ভাবতুম। কিন্তু সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা কিছু আকর্ষণ ছিল, যার জন্যে আমি পরে আরও কয়েকবার তাঁর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। একবার শান্তিনিকেতনেও বেড়াতে গেলুম—নিজের চোখে দেখে আসব, কি রকম আশ্রম তিনি তৈরী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। তবে শান্তিনিকেতন ঘুরে এসে মনে এল এক স্নিগ্ধতার পরিবেশ—চারিদিককার উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটে-চলা মানবের কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝখানে এক শান্তির মরূদ্যান। অতৃপ্ত মানবের জীবনের সম্মুখে এক আদর্শের ইঙ্গিত।

এর পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথকে দেখি। সেখানে তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তা শোনবার জন্যে আমি সেই সভায় যাই। মনে কৌতূহল ছিল সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে শোনা মিহি-মোলোয়েম কণ্ঠ থেকে ইংরেজী বক্তৃতা কেমন শোনাবে। লণ্ডনের সেই সভাতে তাঁর ইংরেজী ভাষায়

বক্তৃতা আমার মন্দ লাগে নি। যতটুকু মনে পড়ে ‘ভূমা’ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন। তাঁর অনেক কথাই আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল।

তখনকার দিনে লণ্ডন, গ্লাসগো, এডিনবারায় ভারতীয়দের কোনো সভাসমিতি হলে ‘জনগণমন’ গানখানি গাওয়া হত। কি যে উন্মাদনা এনে দিত সেই সংগীতে, কী বলব! তখন কে জানত আমাদের সেই ভাল-লাগা গানখানি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে দেখা দেবে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও স্কুল-কলেজে বেশীদিন পড়েন নি, তবুও নিজের অন্তরের তাগিদে, দুর্নিবার জ্ঞানস্পৃহার দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে জীবনভর এক নিবিষ্ট অধ্যয়নের দ্বারা বিচিত্র বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন এসবে অগাধ জ্ঞান তো ছিলই, এমন কি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গ্রহবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর অধিকার ছিল প্রচুর।

বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানের কথাতে মনে পড়ে, ওঁর লেখা বই ‘বিশ্বপরিচয়’। এ বইটি সার্ জেম্‌স্ জীন্‌সের লেখা বইয়ের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি বিজ্ঞানসাধনায় মন দিতেন বা দেবার অবসর পেতেন ,তবে তিনি যে একাধারে কবি ও বৈজ্ঞানিক দুইই হতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও যশের সময়ে অনেক ভক্ত তাঁর চারিদিকে ঘিরে রয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর বাণী, উপদেশ ও কাব্যে মসগুল হয়েছিলেন। অনেকে ওঁর হাবভাব ভাষা

কণ্ঠস্বর নকল করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মনের দিক থেকে অনেক উর্ধ্বে, সেখানে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। বোধহয় তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ ছিল না।

এই সূত্রে আমার জানা একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একবার হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁকে চন্দননগরে কৃষ্ণভামিনী বিদ্যামন্দির দেখতে নিয়ে যান। সেই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস তাঁর কাছে একটি বাণী চেয়ে অটোগ্রাফ খাতা খানা এগিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে এই দুটি লাইন লিখে দেন—

"বসন্ত যে লেখা লেখে বনে বনান্তরে
নামুক তাহারি বাণী লেখনীর 'পরে।"

এ দুটি লাইন কবিতা পেয়ে হেডমিস্ট্রেস অত্যন্ত খুশি হয়ে যান—কবিগুরু তাঁকে কী মহান্ আশীর্বাদ করে গেলেন।

এর প্রায় মাস ছয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় এসেছেন খবর পেয়ে এই হেডমিস্ট্রেস্ ভদ্রমহিলা কলিকাতায় আসেন তাঁর মন্ত্রদাতা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে—তাঁর মনে মনে চলছিল সেই দুটি লাইনের আশীর্বাদের রেশ—ও যেন তাঁর বীজমন্ত্র। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে কবির সঙ্গে দেখা করেন। কবি তাঁকে চিনতে পারেননি দেখে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন, সেই তাঁর চন্দননগরে যাওয়ার কথা, সেই স্কুলের কথা আর তাঁর অটোগ্রাফ খাতায় লেখা দু লাইন বাণীর কথা। কবিগুরু বললেন, তাই নাকি? ওঃ, তা হবে; বলেই রবীন্দ্রনাথ আবার নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। হেডমিস্ট্রেস বেরিয়ে এলেন ক্ষুণ্ণ মনে। যে বাণী তাঁর শয়নে স্বপনে ধ্যান

হয়ে রয়েছে সেই বাণীর প্রদাতা গুরু কিনা বলেন—"তা হবে"। ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ নির্লিপ্ত, সাধারণ দেওয়া-পাওয়ার বাইরে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও সাধনা এমনই উঁচুস্তরের যে, কেবল-মাত্র যদি তিনি প্রবন্ধই লিখে যেতেন তাতেই যশস্বী হতেন; কিংবা কেবলমাত্র উপন্যাস, ছোটগল্প অথবা গানের জন্যেই তিনি অমর হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে কৈশোর থেকে যৌবনে এনে দিয়েছেন। বাংলাভাষা এখন পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রসঙ্গত বলি, বাংলাভাষা তাড়াতাড়ি পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছবে যদি আরও কিছু সংখ্যক ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ বাঙ্গালী (বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মত) বাংলাভাষার চর্চা করেন। বাংলাভাষার উন্নতির জন্যে ইংরেজী ও ফরাসী এই দুই বনেদী ভাষার সাহায্য বিশেষ দরকার।

যাক, তবে এটা অবশ্য কেউ মনে করবেন না যে, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তিনি অবশ্যই বিশ্বকবি। তিনি এক জীবনে বাংলা ভাষাকে শতবর্ষ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। তবে পৃথিবীতে অর্থাৎ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে আরও অনেক প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক জন্মেছেন, কোনো কোনো লেখক তাঁর চেয়ে বেশী বই লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বিদেশী সাহিত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন। তাঁরা একথাও বলবেন যে, যদিও

রবীন্দ্রনাথের নাম ভারতবর্ষে খুবই বাড়ছে, কিন্তু বিদেশ তাঁকে ভুলতে আরম্ভ করেছে, আগের যশ আর এখন নেই। তবে ভারতবর্ষে তিনি অনন্যসাধারণ—আভিজাত্য, বিদ্যা, বহুমুখী প্রতিভা, নানা দেশ ভ্রমণের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা—এত বিভিন্ন গুণের সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন্ সাহিত্যশিল্পীর মধ্যে দেখা গেছে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়

এঁর পরিচয় পরে দিচ্ছি। তার আগে দু'চারটা কথা বলে নি।

প্রথম কথা, যাঁরা বড় ফ্যাক্টরিতে টেক্‌নিক্যাল লাইনে কাজ করেন, তাঁদের পক্ষে মটরগাড়ী রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়। দু'চার জন নতুন গাড়ী কেনেন, অন্য অনেকে সস্তায় পুরোনো গাড়ী কিনে খুব কম খরচে গাড়ী চালু রাখতে পারেন। তাঁরা কেউই ড্রাইভার রেখে ১৫০/২০০ টাকা খরচ করেন না, করতেও পারেন না; নিজেরাই গাড়ী চালান। এই সব কারণে একটা বড় ফ্যাক্টরির বিস্তর কর্মী গাড়ী রাখতে পারেন ও রাখেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলি, যাঁরা ড্রাইভার রাখেন তাঁরা সস্তায় পুরোনো গাড়ী কেনেন না, তাঁরা নতুন গাড়ীই কেনেন।

দ্বিতীয়ত, একটা অ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর পোষা বেশ ব্যয়-সাধ্য, একটি ছেলে মানুষ করার সমান।

তৃতীয়ত, ১৯৫০/৫৫ সালে একজন ভারতীয় লেখকের পক্ষে, লেখার উপার্জনে সংসারের খরচ চালিয়ে, জমি কিনে বাড়ী করা খুবই শক্ত ছিল।

উপরের তিনটি বিষয়ের মর্ম যে কোন শিল্পনগরীর লোকেদের অজানা নয়।'

এইবার আসল কথায় আসি। ১৯৫৭ সালে বিহারে এক বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময়ে কারখানার লোকেরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে আমায় প্রেসিডেন্ট করে। সেই উপলক্ষে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করায় উনি এসেছিলেন। ওঁকে আদর-আপ্যায়নের ভার আমার ওপর ছিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এম. ডি.) ছিলেন একজন প্রবীণ মাদ্রাজী ভদ্রলোক। উৎসব আরম্ভের আগে আমাকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের এম. ডি-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। এখন এই মাদ্রাজী ভদ্রলোক রবি ঠাকুরের নাম ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সেইজন্য পরিচয় করার সময়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন যে-সে লোক নন, তিনি বাংলা সাহিত্যের লেখক হয়ে নাম করেছেন ও বিস্তর অর্থ উপার্জন করছেন। তাই আমি এই বলে এম. ডি.-র কাছে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম: Here is Mr. Tarashankar Banerjee, our chief guest. He is a great and renowned writer. He has built his own house in Calcutta. He keeps a car, keeps a driver and keeps an alsatian dog.

এছাড়া তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্যিক হিসাবে গৌরব ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বোঝাবার অন্য কোন পথ আমি খুঁজে পাই নি; কারণ আমাদের ভারতবর্ষে তখনও পর্যন্ত এক প্রদেশের সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে অন্য প্রদেশের বা অন্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের পরিচয়ের সেতুবন্ধ রচিত হয় নি। আজও অবশ্য রচিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না। তবে

আমাদের মাদ্রাজী এম. ডি-র কাছে এ পরিচয় অমোঘ ও অব্যর্থ হয়েছিল।

যাক, এ পরিচয়ের পর এম. ডি. একটু বিস্ময়ে তারাশঙ্কর-বাবুর দিকে চাইলেন, তারাশঙ্করবাবু বোধ হয় যেন একটু মুচকি হাসলেন, হয়ত বা একটু অসোয়াস্তি বোধ করলেন। দু'জন দু'জনকে অভিবাদন করলেন ও দু'চারটা কথাবার্তা বললেন। তারপর আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

মিস্টার বাসু

বাংলার বাইরে থেকে কলকাতায় নিউ সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিংসে কাজ করতে এসে লক্ষ্য করলুম আফিসের সকলে আমায় 'মিস্টার বাসু' বলে ডাকে। দু'চার জনকে বললাম, আমায় 'বোস' বলে ডাকবেন, বলাতে আমার মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে চাইলেন, কেউ আবার একটু মুচকি হাসলেন। তারপর থেকে একে একে সকলে আমায় 'বোস' বলতে লাগলেন।

কিছু দিন থাকবার পর শুনলুম, এখানে বিজয়চন্দ্র বসু নামে যিনি কাজ করেন তিনি আগে আপার ডিভিশান ক্লার্ক ছিলেন। বছর তিনেক আগে অফিসার হয়েছেন। অফিসার হয়েই তিনি দরখাস্ত করে, তাঁর নাম B. C. Bose থেকে বদলে B. C. Basu করেন। তারপর থেকে তিনি বাসু সাহেব বা মিস্টার বাসু নামে অভিহিত হয়ে আসছেন।

যাই হোক, দেখলুম যে, বড় সরকারী অফিসারদের বাংলায় 'বসু' ও ইংরেজীতে 'Basu' লিখতে হয়, বলতে হয় 'বাসু'। যাঁরা অফিসার নন, তাঁদের 'বসু' বা 'Bose' লিখতে হয়, বলতে হয় 'বোস'। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা সমাজে তেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম কিছু নেই। অবশ্য মিলিটারিতে 'বাসু' অনেক কাল ধরে চলে আসছে। ব্যারিস্টাররাও 'বাসু' ব্যবহার করেন। সার কথা হল, সরকারী বড় অফিসারকে আপনি যদি বলেন,

মিস্টার 'বোস', কিংবা যদি তাঁর নাম লেখেন Mr. বা Shri Bose, তবেই কেলেঙ্কারি করলেন।

কিন্তু ভাবি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের সময়ের আগে থেকে ডাট্, মিটার, রে, সিন্‌হা, টেগোর ইত্যাদি, হয়েছিল কিন্তু বাসু কেন হয় নি! তাঁর দুর্ভাগ্য, তাঁর বোস ইন্‌সৃটিটিউটের দুর্ভাগ্য। Bose Institute আজ অবধি Basu Institute হয় নি। আর দুর্ভাগ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। তাঁর পদবী কখনও বাসু বা Basu হয় নি, তিনিও চিরকাল Bose রয়ে গেলেন।

আরও একজনের দুর্ভাগ্য। তিনি হচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় তিনি ও আইনস্টাইন একটা আবিষ্কার করেছিলেন। সেটার নাম বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিকস্ (Bose Einstein Statistics); বসু বা বাসু-আইনস্টাইন স্টাটিসটিকস বলা হয় না অথবা ইংরেজীতে Basu-Einstein Statistics ও লেখা হয় না।

সুবোধবাবুর বাড়ী কেনা

সুবোধবাবু কলকাতায় বাড়ী কিনবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে বলে রাখলেন, একটু খোঁজ খবর রাখতে। নতুন দোতলা অন্তত আটখানা ঘরওয়ালা বাড়ী চাই, তার সঙ্গে গ্যারেজও চাই। দাম আশি হাজার, একলাখের মধ্যে। একটু পুরোনো হলেও চলতে পারে। উত্তর, মধ্য বা দক্ষিণ কলকাতায় হওয়া চাই। পাইকপাড়া, নারকেলডাঙ্গা, বেহালা, নিউ আলিপুর, যোধপুর পার্ক, যাদবপুর, টালিগঞ্জ হলে চলবে না।

সুবোধবাবু নিজেও খুব ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এক-জন খবর দিলেন উত্তর কলকাতায় একটা বাড়ী বিক্রী হবে। সুবোধবাবু গিয়ে বাড়ী দেখলেন। সবশুদ্ধ আটখানা ঘর আছে, রান্নাঘর আছে, গ্যারেজ আছে, জমি প্রায় আড়াই কাঠা। বড় রাস্তার ওপর আলো-হাওয়া বেশ আছে। একটু পুরোনো। দাম ষাট হাজার। আট দশ হাজার খরচ করলে, প্রায় নতুন হয়ে যাবে। কিন্তু একতলায় একজন ভাড়াটে আছে। সুবোধবাবুর মনে হল দাম সস্তা। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে বুঝলেন, কেস করে ভাড়াটাকে ওঠাতে তিন চার বছর লাগবে। অতএব এ বাড়ী কেনার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল। ভবানীপুরেও একটা ভাল বাড়ীর খবর পেলেন। কিন্তু বড় সরু রাস্তার ওপর। আরও কয়েকখানা বাড়ী দেখলেন বৌবাজার ও শ্যামবাজার এলাকায়; কোনটাই ঠিক পছন্দ হল না, হয়

আলো-হাওয়া কম, নয় বস্তি বা বাজারের ধারে ; নয় গলির ভেতর, নয় দাম বেশী।

জমি কিনে বাড়ী করার কথা ভাবতে লাগলেন। ওঁর পছন্দমত পাড়ায় জমির দাম অন্তত পঁচিশ হাজার করে কাঠা। তার ওপর বাড়ী তৈয়ারী হলে দাম এক লাখের অনেক বেশী পড়ে যাবে। কলকাতার একটু বাহিরে হলে জমি সস্তায় পাওয়া যায়; কিন্তু উনি সহর থেকে একটু দূরেও থাকা পছন্দ করেন না, আর মশার কামড় খেতে চান না। কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছেন না ; এদিকে বছর দেড়েক সময় পার হয়ে গেল। তার মধ্যে আবার বাড়ীর দাম, জমির দাম, মালমশলার দাম বেড়ে যেতে লাগল ; কুলি-মিস্ত্রির মজুরিও বাড়ল। মহা সমস্যায় পড়লেন।

ইতিমধ্যে দু'চারজন অবাঙ্গালী বন্ধু বললেন, কলকাতায় এত multi-storied building হচ্ছে, তার একটা ফ্ল্যাট কিনুন। উনি বললেন, ফ্ল্যাট! ফ্ল্যাটে আবার মানুষ থাকতে পারে? বন্ধুরা বললেন, ফ্ল্যাটে আমরা থাকি, আমরা কি মানুষ না? অবশ্য আমাদেরগুলো multi-storied building-এ নয়। কিন্তু এর ফ্ল্যাট চমৎকার, এগুলোকে luxury ফ্ল্যাট বলে। একেবারে ওপরে থাকবেন, হাওয়ায় প্রায় উড়ে যাবেন। লিফটে করে ওঠা-নামা করবেন। চমৎকার ফ্যাশানেবল ব্যাপার হবে। দু'এক জায়গায় গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌সন করে আসুন না?

সুবোধবাবু বললেন, আপনারা এখানে দু'চার বছর থাকবেন, আপনাদের কথা আলাদা। আমায় চিরকাল কটাতে হবে। যাহোক, তবুও উনি গোটাদু'য়েক multi-storied

bulding-এর ফ্ল্যাট দেখলেন। একেবারে উপরে উঠলে সারা কলকাতা চমৎকার দেখায়, খুব হাওয়া, যেন মনে হয় পাহাড়ে বাস করছি ; দারোয়ান আছে, লিফট তো আছেই। যারা ফ্ল্যাটে থাকে তারা বেশ স্টাইলের উপর থাকে। দু'চার জনের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বেশী রকম ভদ্র, সকলেই ফ্ল্যাট কিনতে উৎসাহ দিল।

এবার সুবোধবাবু দু'চার জন আত্মীয়কে সঙ্গে করে দু'একটা ফ্ল্যাট দেখিয়ে আনলেন, তাদের কী মত তা জানবার জন্যে। কেউ কেউ বললেন, ফ্ল্যাট-ট্ল্যাট সব বম্বেতে চলে, কলকাতায় কি সুবিধে হবে? ওপর-তলার ফ্ল্যাটের লোক যদি মেঝেতে হাতুড়ি ঠোকে বা পেরেক মারে বা মশলা পেষে, কিংবা যদি পাশের ফ্ল্যাটে ক্লাব ক'রে সারারাত গান করে, তা হলেই তো কেলেঙ্কারি হবে। আবার কেউ বললে, মন্দ কি। সব সুখ-সুবিধে আছে, গিন্নীর খুব আরাম হবে, ওপর-নিচ করবেন মজা করে লিফটে করে, বেশী হাঁটাহাঁটি করতে হবে না, সবই হাতের কাছে পাবেন।

সুবোধবাবু আবার মালিকদের সঙ্গে দেখা করে ঐ সব ঝঞ্ঝাটের কথা বললেন। তারা প্রত্যেকেই বললে, এ সব সত্তর আশি বা লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাট, বাজে লোকে এ সব ফ্ল্যাট কেনে না। সবাই খুব ভদ্র ও শিক্ষিত। ওসব কোনো ঝঞ্ঝাট একেবারেই হবে না।

শেষ অবধি সুবোধবাবু গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা আটতলার ওপর ফ্ল্যাট সত্তর হাজার টাকা দিয়ে কিনে

ফেললেন। নিরানব্বই বছরের লিজ্। মাসিক পঞ্চাশ টাকা জমির ভাড়া, পঞ্চাশ টাকা মেন্‌টিন্যান্স ও তিন মাস অন্তর দেড়শ টাকা করপোরেশন ট্যাক্স।

রাস্তার দিকে দুটো বেডরুম, সামনে টানা বারাণ্ডা, প্যানট্রি, কিচেন, বেশ বড় ড্রইং কাম-ডাইনিং রুম। দুটো বেডরুমের সঙ্গে দুটো বাথরুম, বাথটাব, বেসিন, ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল ও কমোড দেওয়া। কিচেনের পাশে একটা ছোট দেশীয় ধরনের বাথরুম। একতলায় গাড়ী রাখবার জায়গা।

সুবোধবাবু সপরিবারে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। লিফটে ওঠা-নামা মেয়েদের আর ছোটদের খুব পছন্দ হল। সব দেখে শুনে আত্মীয় স্বজনরা খুব তারিফ করলেন। বাড়ীর অন্যান্য ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন তাঁদের সকলের সঙ্গে আলাপ হল। এঁদের সকলকেই সুবোধবাবুর ও ওঁর স্ত্রীর বেশ ভাল লাগল।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে অনেকগুলি অসুবিধা লক্ষ্য করলেন। যেমন ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। খাবার সময়ে যদি কেউ ডাকতে এল, চাকর দরজা খুলে তাকে বসাল, তিনি বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিন্তু পরদা-টানা খাবার জায়গায় যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, চামচে ছুরি কাঁটা গ্লাস জগ ইত্যাদির ব্যবহার খুব সাবধানে করতে হল, কেন না যিনি দেখা করতে এসেছেন, তিনি একদম পাশেই বসে আছেন। তাঁর নাকে অমলেট, মাছের ঝাল বা মাংসর গন্ধ যেতে লাগল, এমন কি ভাজা, তরকারি দই মিষ্টিরও গন্ধ তিনি

পেতে লাগলেন। প্রতি শব্দ, ফিস্‌ফাস কথা তাঁর কানেতে যেতে লাগল। যে বা যারা দেখা করতে এসেছে, তারা বন্ধু বা অফিসের লোক হতে পারে, স্ত্রীর কাছে বা ছেলেমেয়েদের কাছে আসতে পারে। আবার তাদের সঙ্গে যদি ছোট ছেলে থাকে তো সে হয় তো পর্দা সরিয়ে খাবার টেবিলে এসে যাবে ও হয়তো তার বাবা-মার কাছে গিয়ে বলবে, জান ওখানে বড় বড় কলা আছে।

সুবোধবাবুদের বসবার ও খাবার ঘর এক হওয়া একদম পছন্দ হল না। যদিও যখন খাওয়া না হয় ও পর্দা সরিয়ে দেওয়া থাকে তখন ঘরটা প্রকাণ্ড দেখায় ও যেন বড়-লোকের বাড়ী মনে হয়। এত বড় পর্দা রোজ এত বার এদিক-ওদিক করা এক ঝঞ্ঝাট, আবার সমস্তক্ষণ টানা থাকলে ছেলেরা ও চাকর-বাকররা যাতায়াত করে ময়লা করবে ও তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যাবে। আর একটা অসোয়াস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে খাবার জায়গায় রেফ্রিজারেটার রাখা, উদ্দেশ্য যেন, বাইরের লোককে (নিমন্ত্রিত) জানানো যে আমার 'ফ্রীজ' আছে—এটা খেলো বড়মানুষী। প্যানট্রি বা কিচেন এত ছোট যে এটাকে সেখানে রাখা যায় না। সুবোধবাবু, একজন বেশ সচ্ছল জানাশোনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন এই একই ব্যাপার; ড্রইং কাম-ডাইনিং-রুম, ও সেখানে রেফ্রিজারেটর রাখা। সুবোধবাবু তাঁকে বললেন, আপনার এত পয়সা, বড় বাড়ী, ঘরও অনেক, খাবার ঘরটা এই বসবার ঘরে মিশিয়ে দিলেন কেন? পাশের ঘরটা খাবার ঘর করন না কেন?

তিনি বললেন, এইটাই ত স্টাইল। আমি বম্বেতে দিল্লীতে দেখেছি, ওরা ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম করে। সুবোধবাবু বললেন, ওরা করেছে বলে আপনিও করবেন? খেতে খেতে অন্য লোক এসে গেল; আপনার লজ্জা করবে, তারও লজ্জা করবে। কোনো প্রাইভেসি থাকে না। তবে তো ড্রইং-কাম-ডাইনিং-কাম-বেডরুম করলেই হয়, আপনার স্ত্রী শুয়ে আছেন, সে সময়ে বাহিরের লোক এল, তা আর কি হবে। ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। সুবোধবাবু বললেন, যার সামর্থ্যে কুলোয় সে আলাদা-আলাদা ঘর রাখবে। যার সামর্থ্যে কুলোবে না, সে একখানা ঘরওলা বাড়ীতে থাকবে; আর অন্য কোনো উপায় নেই, একটা ঘরেই তাকে সব বন্দোবস্ত করতে হবে। বিলেতে যে সস্তায় থাকতে চায় সে বেড-সিটিং রুমে থাকে, তার একখানা ঘরই সব। কেউ এলে সেই ঘরে বসে, খাওয়াও সেই ঘরে হয়, শোয়াও সেই ঘরে হয়। এটা একেবারেই স্টাইলের কথা নয়। আর খাবার ঘরে রেফ্রিজারেটর থাকবে কেন? বাইরের লোককে দেখাবার জন্য যে আপনার ঘরে রেফ্রিজারেটার আছে? ওর জায়গা হল কিচেনে, বা প্যানট্রি থাকলে সেখানে। যা হোক, কথাগুলো ভদ্রলোকের মনঃপুত হল না, হাসাহাসি করে এ আলোচনার সমাপ্তি হল।

সুবোধবাবুর বাথরুমের বন্দোবস্ত পছন্দ নয়। বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, যেখানে ঘামে গা প্যাচ প্যাচ করে, সেখানে স্নান করবার সময়ে জল গায়ে পড়ে বেরিয়ে যাবে। মেঝেয় দাঁড়িয়ে বা বসে শাওয়ারের তলায়, বা মগে করে বালতি বা

চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে মাথায় ঢালা—এতে কোন নোংরামী নেই। বাথটাবে ওই টুকু বদ্ধ জলে স্নান করলে কি আরাম হয়? ওতে ত ঘেন্না করে। তা ছাড়া স্নান হয়ে গেলে বাথটাবের জল ছেড়ে দেবার পর টাবের ভেতরে সমস্তটা ময়লা লেগে থাকে। সে সব সাফ করা এক মহা ঝকমারির ব্যাপার। বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাথটাবে চান করার কোন মানে হয় না। আমাদের বাথরুমের মেঝে সব সময়ে শুকনো খট্‌খটে থাকবে, তা হয় না, জল পড়ে থাকবেই। সেই জন্য মেজের লেবেল এমন হবে যাতে জল জমে থাকবে না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে।

সুবোধবাবু আর একটা অসুবিধে মনে করতেন যে, বাহিরের কোনো লোক তাঁর কাছে এসেছে। সে যদি বাথরুমে যেতে চায়, তাকে শোবার ঘরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেজন্যে অ্যাটাচ্‌ট্ বাথরুম থাকলে, বাহিরের লোকদের জন্যে আর একটা বাথরুম থাকা দরকার।

উনি আরও একটা ব্যাপার ভাবতেন যে, নিজেদের শোবার ঘরে অ্যাট্যাচ্‌ট্ বাথরুম একটা থাকলে হবে না, দুটো থাকা দরকার। একটা কর্তার জন্যে আর একটা গিন্নীর জন্যে। মেয়েরা বাথরুম ব্যবহার করলে, খানিকক্ষণ সে বাথরুমে যাওয়া যায় না। এমন একটা গন্ধ বেরয় তেলের, সাবানের, পাউডার ইত্যাদির যে সব পুরুষ মানুষের তা ভাল লাগে না। তা ছাড়া মেয়েরা একবার বাথরুমে ঢুকলে দেড়ঘণ্টার আগে বেরন না। সকাল বেলা স্বামীস্ত্রীর দু'জনেরই একসঙ্গে দরকার। সেজন্যে

ওঁর মতে, যাঁর পয়সা আছে, তিনি নিজের শোবার ঘরের জন্যে ছুটো বাথরুম করাবেন।

সুবোধবাবুর স্ত্রী রাঁধবার জন্য ফ্ল্যাটে এসেই ছুটো জনতা স্টোভ কিনে আনিয়েছিলেন। কয়লার উনুন ত চলবে না। পাম্প করা স্টোভও চলবে না ; জ্বালানো ঝঞ্ঝাট ও ফেটে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে এখন আউট-অব-ডেট। অন্য অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা কেউ জনতা স্টোভ ব্যবহার করে, কেউ আবার সিলিণ্ডার-ওলা গ্যাস স্টোভ ব্যবহার করে। কিছুদিন জনতা ব্যবহার করবার পর দেখলেন এতেও একটু ঝঞ্ঝাট আছে; রোজ কেরোসিন তেল ঢালা, কিছুদিন অন্তর পলতে কাটা, পলতে বদলানো—এসব করতে হয়। যারা সিলিণ্ডারের গ্যাসে রান্না করেন,সুবোধবাবু ও ওঁর স্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলেন যে যদিও এই গ্যাসের উনুনে বেশ ভাল আঁচ হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু একটা বড় অসুবিধে যে গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, ওদের আফিসে টেলিফোন করতে হয় ও নতুন সিলেণ্ডার আসতে ২।৩ ঘণ্টা লাগে। একজন ফ্ল্যাটওয়ালা বললেন, কদিন আগে আমি দু'জনকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেছিলুম। সেজন্য রান্না করছি, সন্ধ্যা ৭টায় গ্যাস গেল ফুরিয়ে। রাত্তিরে সিলিণ্ডার পাওয়া যায় না, ওদের আফিস বন্ধ, সেই পরের দিন সকালে টেলিফোন করে আনাতে হবে। কি করি ! পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে, ওঁদের একটা বাড়তি জনতা স্টোভ ছিল, সেটা চেয়ে নিয়ে এসে মুখ রক্ষা হল।

সুবোধবাবু ভাবতে লাগলেন, এ সমস্যার সমাধান একটা

করা দরকার। ভেবে ঠিক করলেন যে গ্যাস কোম্পানীর পাইপ আনাতে পারলে হয়। তিনি নিজে গ্যাস কোম্পানিতে খবরাখবর করলেন। জানতে পারলেন, গ্যাসের লাইন আনার কোনো অসুবিধে নেই, কেবল তার খরচা দিতে হবে। সুবোধবাবু আরও ক'জন ফ্ল্যাটওয়ালাকে নিয়ে মালিককে অনুরোধ করলেন। মালিক বললেন, কেন, গ্যাস সিলিণ্ডারই তো আজকাল চলে, বিস্তর লোকে ব্যবহার করে। মালিক রাজী হবে কেন? গ্যাস লাইন রাস্তা থেকে আনা, ভেতরে পাইপ লাগানো—এ সব তো অনেক খরচা। সুবোধবাবু বললেন, সিলিণ্ডার ব্যবহার করবে যারা ফ্লাটের ভাড়াটে বা কলকাতায় ২।৩ বছর থেকে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে, তারা। তারা এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবে না, তাদের সিলিণ্ডার নিলেই চলবে, ফুরলে খবর দিয়ে আনিয়ে নেবে। আমাদের ফ্ল্যাট নিজেদের, আমরা এখানে চিরকাল থাকব, এখানে পাকাপাকি বন্দোবস্ত রাখতে হবে। যেমন আছে ইলেকট্রিক আর কলের জল। কলকাতা শহরে যখন গ্যাসও সেই রকম পাওয়া যায়, সেটাও নিতে হবে। যাক, তর্কাতর্কির পর ঠিক হল খরচের কিছু কিছু ভাগ প্রত্যেককে দিতে হবে, তা হলে গ্যাস কোম্পানি গ্যাসের লাইন লাগাবে ও প্রতি ফ্ল্যাটের মিটার বসিয়ে দেবে।

মাসখানেকের ভিতর সকলেই এই গ্যাসে রান্না করতে লাগলেন। কিছু লোকের ধারণা, এই গ্যাস প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু সুবোধবাবু খবর নিয়ে জেনেছেন, বছরে হয়তো একবার হতে পারে, তবে বছরে দু'একটা রবিবার ৭।৮ ঘণ্টার

জন্যে হয়তো গ্যাসের প্রেসার কম করে দেয় কোন মেরামতি কাজের জন্য। তবে প্রেসার কমাবার ৩।৪ দিন আগে খবরের কাগজে নোটিশ দেয়, লোকে সেই অনুসারে রান্নার বন্দোবস্ত করে।

সুবোধবাবুদের রান্নার বেশ বন্দোবস্ত হল।

তা ত হল। কিন্তু সুবোধবাবু আর ওঁর স্ত্রী ঠিক যেন সোয়াস্তি পান না। সব সুবিধে সত্ত্বেও যেন আরাম নেই। ফ্ল্যাটের সীমিত জায়গায় হাঁপিয়ে উঠতে লাগলেন। যেন সোনার খাঁচায় আছেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলবার জায়গা নেই ; খেলতে হলে নিচে যেতে হয়, যেখানে গাড়ীগুলো থাকে অথবা রাস্তায়। অতএব ছেলেমেয়েরা যে একটু দৌড়োদৌড়ি করে খেলবে, তা পারে না। মনে হয় যেন বন্দী-অবস্থা, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাস্তায় হেঁটে বা গাড়ীতে বেড়াতে বের হন।

বছর খানেকের মধ্যে তিক্তিবিরক্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক করে ফেললেন ফ্ল্যাটে থাকবেন না, বিক্রী করে দেবেন। নিজস্ব সম্পূর্ণ বাড়ীর বন্দোবস্ত করবেন, তা সে যদি সহরের একটু বাহিরেও হয় তাও স্বীকার। তৈরী না পেলে তৈরী করিয়ে নেবেন, তবু ত হাঁফছেড়ে বাস করতে পারবেন। তবে সহরের ভেতর হলেই সব চেয়ে ভালো ; মশার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না।

খবর নিয়ে জেনেছি সুবোধবাবুর মনোমত বাড়ী এখনও হয় নি, সমস্যা রয়েই গেছে।

কুলিকে সাবধান

ভবনাথবাবু কলকাতা হেডকোয়ার্টার্সে কাজ করেন। সেই অফিসের সুধাংশুবাবু ডিসেরগড় থেকে টেলিফোনে ভবনাথবাবুকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রী লিখেছেন কলকাতা থেকে দুদিন পরে শনিবারে একা ডিসেরগড়ে (আসানসোল থেকে বারো মাইল) যাবেন ও অমুক ট্রেনে আসানসোলে পৌঁছবেন। সুধাংশুবাবু সে সময়ে আসানসোল স্টেশনে জীপ নিয়ে হাজির থাকবেন। এ খবরটা যেন ভবনাথবাবু সুধাংশুবাবুর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন। ভবনাথবাবু খবরটা পাঠিয়ে দিলেন ও পরের দিন অফিস থেকে সুধাংশুবাবুকে ডিসেরগড়ে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি শনিবারেই যাচ্ছেন।

শনিবার দিন যথাসময়ে সুধাংশুবাবুর স্ত্রী আসানসোলে পৌঁছলেন। ট্রেনে খুব ভীড়, আসনসোল প্লাটফরমেও বিস্তর লোক। এ স্টেশন থেকে নানান জায়গার লোক ওঠা-নামা করে। কুলি দিয়ে মাল নামিয়ে ওঁর স্ত্রী ভীড়েতে চারদিকে চাইতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে আর পান না। কুলিও 'মাইজী চলিয়ে, মাইজী চলিয়ে' করতে লাগল। উনি যত বলেন, একটু দাঁড়াও আমার লোক এসেছে, কুলি সে কথা গ্রাহ্য করে না, কেবল তাগাদা করছে আর বলছে, 'এত্তা ভীড়সে আদমীকো নেহি মিলে গা, টিসানকা বাহারমে মিলে গা'। উনি আর কি করেন, অগত্যা কুলির সঙ্গে ওভারব্রীজ দিয়ে স্টেশনের বাহিরে

এলেন। এসে রাস্তায় বিস্তর গাড়ী ছিল তার মধ্যে জীপ আছে কিনা দেখতে লাগলেন। কতগুলো ট্যাক্সিওয়ালা এসে ঘিরে ধরল, জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোথায় যাবেন চলুন। কুলিটাও বিরক্ত করতে লাগল, 'হাম্‌কো ছোড় দিজিয়ে, বহুত দেরী হোতা'। একটা ট্যাক্সিওয়ালা কুলিটাকে নিয়ে মাল তার ট্যাক্সিতে রেখে দিল, কুলিটাও পয়সা চাইতে লাগল। ট্যাক্সি-ওয়ালা খুব বিনয় করে জিজ্ঞাসা করল, মা আপনি কোথায় যাবেন? উনি বললেন, ডিসেরগড়। অমনি ট্যাক্সিওয়ালা বললে, ওঃ, ডিসেরগড়? আমার ট্যাক্সি ত ওখানকারই। আমি ওখানে সব বাংলো চিনি। চলুন, কোন অসুবিধে হবে না। ভদ্রমহিলা বললেন, আমার জীপ আসার কথা। আবার মনে মনে ভাবলেন, ওঁকে দেখতে পেলুম না, জীপও দেখতে পাচ্ছি না, বোধ হয় রাস্তায় জীপটা খারাপ হয়ে গেছে, কেন না জীপটা প্রায়ই খারাপ হয়। দোনামোনা করে উনি কুলিকে পয়সা দিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলেন, এই আশা নিয়ে যে পথে জীপটাকে দেখতে পাবেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে জীপের নম্বরটাও বলে দিলেন। যেতে যেতে পথে জীপ দেখা গেল না।

যাই হোক, আধ ঘণ্টার ভিতর বাড়ী পৌঁছতে চাকর বলল, সাহেব অনেকক্ষণ আগে জীপ নিয়ে স্টেশনেই গেছেন। ভদ্রমহিলা আবার নতুন ভাবনায় পড়লেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে বারোটা টাকা ভাড়া দিয়ে বললেন, আপনি ত স্টেশনে ফিরে যাচ্ছেন, জীপটা দেখলে বলবেন যে আমি বাড়ী চলে এসেছি।

ট্যাক্সিওয়ালা আসানসোল স্টেশনে পৌঁছে দেখল স্টেশন

ফাঁকা, দু'চার খানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে সেই জীপ। জীপের কাছে গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললে। জীপ ড্রাইভার অবাক হয়ে বললে, মেমসাহেব এসে গেছেন! এ দিকে সাহেব মেমসাহেবকে দেখতে না পেয়ে মনে করেছেন, ট্রেন ফেল করেছেন, পরের ট্রেনে আসছেন। তাই সাহেব পরের ট্রেনের জন্যে প্লাটফরমে অপেক্ষা করছেন। যাক, তখনই ড্রাইভার প্লাটফরমে গিয়ে সাহেবকে নিয়ে এসে বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ী ফিরে স্বামী-স্ত্রীতে খুব এক চোট কথা কাটাকাটি হল; ইনি ওঁর দোষ দেন, উনি এঁর দোষ দেন। স্ত্রীর ব্যাপারটা তো বলা হয়েছে। এবার স্বামীর ব্যাপারটা বলি। উনি ঠিক সময়েই স্টেশনে এসেছিলেন, অনেক গাড়ী আগে থেকেই স্ট্যাণ্ড-এ দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জন্যে জীপটাকে অন্য দিকে খানিকটা দূরে রাখতে হয়েছিল। প্লাটফরমে ওই ট্রেনে যাবার প্যাসেঞ্জার অনেক ছিল, তার ওপর অনেক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা থামাতে ট্রেন থেকে নামল, প্লাটফরম লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেল। ভদ্রলোককে সেই ভীড় ঠেলে গার্ডের গাড়ী থেকে ইঞ্জিন, ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ী দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছিল। অবশেষে না পেয়ে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় এক ঘণ্টা পরের আর একখানা ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ এত যে আগাম বন্দোবস্ত, ট্রাঙ্ক টেলিফোন, সবই বৃথা হল।

এই আখ্যানের একটা মর‍্যাল আছে। সেটা হচ্ছে—যদি আপনাকে নিতে আসবার জন্যে স্টেশনে লোক আসবার বন্দোবস্ত

থাকে ও ট্রেন যখন প্লাটফরমে ঢুকছে তখন যদি তাকে না দেখতে পান, তবে কুলিকে দিয়ে গাড়ী থেকে মাল প্লাটফরমে নামিয়ে কুলিকে বেশী পয়সা কবুল করে বলবেন দশ মিনিট সেখানে দাঁড়াতে, কেন না আপনাকে নিতে লোক এসেছে। যদি ও বলে যে অপেক্ষা করতে পারব না তখন ওকে ২৫/৩০ পয়সা কি আরও বেশী দিয়ে বিদেয় করে দেবেন ও পরে যখন দরকার হবে অন্য কুলি নেবেন।

কুলি সম্বন্ধে আর একটা মর‍্যাল—কুলিরা বড় হড়্‌বড়্‌ করে, মাল মাথায় নিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে যায়, আপনাকে পিছনে দৌড়তে হয়। কুলিকে আপনার সঙ্গে আস্তে আস্তে চলতে বলবেন। অবশ্য কুলিরা মাল কখনো নিয়ে পালিয়ে যায় না, সে ভয় নেই। তবে কুলি থেকে বিছিন্ন হয়ে গেলে অসোয়াস্তি লাগে।

তৃতীয় মর‍্যাল হচ্ছে, কুলিরা পয়সার জন্য বড় খ্যাচ্‌ খ্যাচ্‌ করে, ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে সব সময়ে ওদের বেশী পয়সা দেবেন। বেশী মানে আর কত? ধরুন, কুলি পিছু ৭৫ পয়সা বা এক টাকা। নিজের ব্লাডপ্রেসারকে সংযত রাখবার জন্যে এক-আধবার এ টাকা খরচ করা কিছুই নয়। আপনি তো আর রোজ মাল নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছেন না। যাই হক, মোটের উপর মনে রাখবেন, কুলিকে সাবধান।

সবচেয়ে দামী জিনিস, সবচেয়ে সস্তা জিনিস

একটু ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করি—

অনেকদিন আগে, যখন ক'জন বাঙ্গালীর রাইফেল স্যুটিং-এ নাম হয়, তখন আমারও রাইফেল স্যুটিং শেখবার ইচ্ছা হল। কলকাতায় টালিগঞ্জে একটি রাইফেল স্যুটিং ক্লাব আছে, সেইখানে ভর্তি হলুম। প্রতি রবিবারে সকালে নিয়মিত যেতে আরম্ভ করলুম। ক্লাব থেকে রাইফেল ও গুলি দিত। উপুড় হয়ে, মাটিতে শুয়ে, হাঁটুগেড়ে আর দাঁড়িয়ে দূরে বোর্ডে গুলি ছুঁড়তে হত।

কিছুদিন পরে হাত একটু ঠিক হলে একটা রাইফেল কেনার ইচ্ছা হওয়াতে দোকানে গিয়ে খবর নিয়ে জানলুম, একটা পয়েণ্ট টু-টু বোরের রাইফেলের দাম সাতশ টাকা। দাম শুনে রাইফেল কেনা মাথায় উঠে গেল। অন্য আরও দু'তিনটা দোকান ঘুরে একই দাম শুনলুম। একজন পরামর্শ দিল যে, দু'তিনশ টাকায় যদি আমি ভাল রাইফেল কিনতে চাই ত থানায় খবর নিতে হবে, কবে ওদের বন্দুক ইত্যাদির নিলাম হয়। ডাকাতরা বন্দুক, রিভলবার, রাইফেল শুদ্ধ যখন ধরা পড়ে, তখন সেগুলো নিলামে বিক্রী হয়। অনেক সময়ে খুব ভাল জিনিসও থাকে। কবে কোন্ থানায় নিলাম হবে, কে সে খবরাখবর রাখে; সেজন্য সস্তায় রাইফেল কেনার ব্যাপারে আর মাথা ঘামানো হল না। কিন্তু ভাবতে লাগলুম একটা রাইফেলের এত দাম কেন হবে! একটা খুব ভাল স্টিলের

ব্যারেল, ট্রিগার, কাঠের বাঁট ও আনুষঙ্গিক আর কটা ছোট জিনিস মিলিয়ে রাইফেল তৈরী করা হয়। ব্যারেলটার ছ্যাঁদাটা অবশ্য একেবারে নিখুঁত মাপের হওয়া চাই ও ভাল স্টিলের। নিখুঁত মাপের ও খাঁটি মালমশলার তো আরও অনেক জিনিস আছে, যেমন লেদ মেশিন। এতে কত পার্টস আছে, বেশীর ভাগই নিখুঁত মাপে ও ভাল লোহায় তৈরী করতে হয়। একটা সাড়ে তিন ফুট লেদ মেশিনের ইলেকট্রিক মোটর শুদ্ধ যদি দাম হয় দু হাজার টাকা, তবে এই রাইফেলের দাম একশ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। তুলনামূলক ভাবে দেখলে এ কথা বলতে হবে যে রাইফেলের দাম অসম্ভব রকমের বেশী, খদ্দেরকে ভয়ানক ঠকিয়ে দাম নেয়।

কিন্তু এর চেয়েও বেশী দাম নেয় অর্থাৎ মহার্ঘ জিনিস হচ্ছে কোনো কোনো ফাউনটেন পেন। দাম দিতে হয় দু'শো টাকা। একবার ভাবুন দু'শো-টা টাকা। সোনামুখী নিবের দাম ও সোনালী ক্যাপের দাম, টাকা পনেরর বেশী লাগে না, বাকী পার্টসগুলির দাম পড়বে দু'টাকা। অর্থাৎ একটা ওই রকম পেন তৈরী করতে খরচ পড়বে আন্দাজ কুড়ি টাকা। যদিও এটা ঠিক যে ৩০/৪০ বছর ব্যবহার করলেও এর নিব বদলাতে হয় না আর ক্যাপটাও বেশী অপরিষ্কার হয়ে যায় না। একটা দু'টাকা দামের কলমে সেই সব জিনিসই আছে, সেই একই রকম বন্দোবস্ত কালি নেবার। কেবল হয়ত দু'তিন বছর অন্তর টাকা খানেক খরচ করে নিব বদলাতে হয়। রবার টিউবের অবস্থা দু কলমেই সমান। আর যদি দশ-বারো টাকার কলম

কেনা যায়, সেটা হু'শো টাকার কলমের চেয়ে কিছু কম যাবে না। কিন্তু এসব কলম কিনলে আমাদের সম্মান নষ্ট হয় বলে, আমরা কিনি না, আমরা কিনি হু'শো টাকা দামের কলম। তাই বলি সংসারে দুষ্প্রাপ্য জিনিস বাদ দিলে, সবচেয়ে দামী বা মহার্ঘ জিনিস হচ্ছে ফাউনটেন পেন। দ্বিতীয় স্থান হল রাইফেলের।

মহার্ঘ জিনিস কি তা বলা হল, এখন সব চেয়ে সস্তার জিনিস কি? শুনুন তবে। সেটা হচ্ছে মটর গাড়ী। একটা মটর গাড়ী তৈরী করতে কত রকমের জিনিস লাগে ও কত পরিশ্রম দরকার হয়। এতে হাজার পনের টুকরো জিনিস আছে, তার প্রায় সিকিভাগ নিখুঁত করে তৈরী করতে হয়, নিখুঁত মালমশলা দিয়ে। তারপর এতে কত রকম জটিল কাণ্ড-কারখানা। তাছাড়া এর পেছনে কত গবেষণা করা হয়েছে ও হচ্ছে। আর কত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও এর দাম আঠার কুড়ি হাজার টাকা। যদি একটা রাইফেলের দাম হয় সাতশ টাকা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কুড়ি হাজার টাকার মটর গাড়ীর দাম হওয়া উচিত লাখ টাকারও বেশী।

হয়ত সব ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি করে লেখা হল, তবুও বলব, সবচেয়ে দামী জিনিস ফাউনটেন পেন আর সব চেয়ে সস্তার জিনিস মটর গাড়ী।

নিছক পাগলামি ভাবনা

ট্রেন ছুটে চলেছে। একটা কোচের করিডরে একটা ছোট ছেলে ছুটোছুটি করছে। একবার সামনে ইঞ্জিনের দিকে যাচ্ছে, একবার পেছনে গার্ডের গাড়ীর দিকে যাচ্ছে, ঘণ্টায় আন্দাজ তিন মাইল বেগে। ট্রেন যদি ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যায়, তবে ছেলেটার মোট গতিবেগ, সামনের দিকে ছোটবার সময়ে হচ্ছে ঘণ্টায় ৫৩ মাইল; পেছনের দিকে ছোটবার সময়েও ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে ঘণ্টায় ৪৭ মাইল বেগে। এ সহজ তত্ত্ব ত আমরা সকলেই জানি।

কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে একটা লোককে নিয়ে। সে কলকাতা সহরে একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে সে ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল পরিভ্রমণ করছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্যে ঘণ্টায় ৬৮,৪০০ মাইল বেগে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আবার সেই মুহূর্তেই সূর্যও তার পরিবারস্থ গ্রহ-উপগ্রহ, যথা পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র, চাঁদ ইত্যাদি নিয়ে কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্রের সঙ্গে একজোটে 'ছায়াপথ' দ্বীপ জগতের (Milky Way Galaxy) অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে ও সে অবস্থায় আমাদের সৌরজগতের গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১৩৪ মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪,৮২,৪০০ মাইল।

এইই শেষ নয়। পৃথিবীর আরও একটা গতি আছে। তা এই—

ছায়াপথের মত আরও অনেকগুলি দ্বীপজগৎ দিয়ে দ্বীপপুঞ্জ

(cluster of galaxies) তৈরী হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ দ্বীপপুঞ্জ অগণিত সংখ্যায় আছে। এরা প্রত্যেকে একে অন্যের সান্নিধ্য থেকে প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। দ্বীপপুঞ্জগুলির গতিবেগ, যত দূরে সরে যায়, তত বাড়ে। সেকেণ্ডে ১,৪০০ মাইল থেকে ৭০,০০০ মাইল অবধি পাওয়া গেছে। যদি সেকেণ্ডে কম করেও ১,৪০০ মাইল ধরা হয়, তাহলে আমাদের দ্বীপপুঞ্জ ঘণ্টায় ৫০,৪০,০০০ মাইল বেগে দূরে চলে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের সৌরজগতও এই গতিবেগে দূর সরে যাচ্ছে।

তাহলে লোকটির অবস্থা বুঝুন। বেচারী একসঙ্গে নানাদিকে ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল, ৬৮,৪০০ মাইল, ৪,৮২,০০০ মাইল ও ৫০,৪০,০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই এত প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ গতিবেগ, তার ওপর চার রকম গতির সমন্বয়ে লোকটা নিশ্চয় মাথা ঘুরে, পাগল হয়ে, ভূত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে মিলিয়ে যাবে। এ গতির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সে কি অগতির গতি মধুসূদনকে ডেকেছিল ?

কিন্তু আমরা জানি সে মধুসূদনকে ডাকে নি, তার মাথা ঘোরে নি, সে পাগল হয় নি, ভূত হয়ে যায় নি, ব্রহ্মাণ্ডে মিলিয়েও যায় নি। সে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের গতির ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছে না।

যাক, এখন আমার ভাবনাটা হল, লোকটির এই বিচিত্র গতিপথের লেখাঙ্কন (graph), খুব ছোট স্কেলে, করা যায় কিনা আর ওর resultant গতিবেগই বা কত ?

কলকাতা ও পূর্ববঙ্গ—সেকাল ও একাল

৫৫/৬০ বছর আগে কলকাতা অন্য রকমের জায়গা ছিল। কলকাতায় এক দিকে যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ, রাধকৃষ্ণ দেব, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখের ও বৃটিশ চরিত্রের প্রভাব ছিল, অন্যদিকে তেমনি। বিস্তর বড়লোক আরও আগের দিনের মত বিলাসিতা, বাগানবাড়ী, রক্ষিতা নিয়ে দিন কাটাতেন। অনেক মধ্যবিত্ত লোকও বড়লোকদের অনুসরণ করতেন। বৃটিশ জাতকে লোকে ভয়মিশ্রিত-শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তারা রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রচলন করাতে জনসাধারণের সুখসুবিধা অনেক দিক্ থেকে বেড়ে গিয়েছিল। তারা কলকাতাকে city of palaces করেছিল। কলকাতার শিক্ষিত লোক বৃটিশ ভাবধারা অনুসরণ করবার চেষ্টা করত।

কলকাতার বাইরের লোক কলকাতায় এসে বড় বড় বাড়ী, রাস্তা, মাটির তলায় ড্রেন, কলের জল, বড় বড় সাজানো দোকান, ও অসংখ্য সাহেব, মেম দেখে তাজ্জব বনে যেত। সাহেবদের জন্যে এত সব সম্ভব হয়েছে বলে তাদের প্রায়-অতিমানব মনে করত। ফিরিঙ্গিদেরও বোলবোলাও কম ছিল না, বিশেষত ট্রেনে ও রেলস্টেশনে ওদের একাধিপত্য ছিল।

এখন যেমন বেশীর ভাগ ভারতবাসী বৃটিশদের রক্তচোষা ও বদমাইস জাত বলে মনে করে, তখন তা করত না; যদিও

মুষ্টিমেয় কিছু লোক বৃটিশদের, আমাদের দেশে থাকা পছন্দ করত না এবং দু'দশ জন তাদের মারবার জন্যে বোমা তৈরী করেছিল ও কয়েকজনকে হত্যাও করেছিল। এখন অবশ্য কলকাতা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে লোক মারার জন্যে বোমা তৈরী করা কিছু অসাধারণ কাণ্ড নয়।

সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বেশ বিস্তৃতিলাভ করেছিল। এই ধর্মাবলম্বীরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য কাজ করতেন। তবে তাঁরা সাধারণ কলকাতাবাসী থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন। এঁরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য দেবদেবী মানতেন না, প্রতিমা পূজায় বিশ্বাস করতেন না। এইজন্যে ও হয়ত কতকটা হিংসায়, সাধারণ কলকাতাবাসীরা এঁদের 'বেম্যজ্ঞানী', 'ওঁ তৎসৎ বেম্যজ্ঞানীর নাকে খৎ' ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করত। রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেলেও তাঁর এখনকার মতো নাম ছড়ায় নি, তাঁর গান নাটক নিয়ে সাধারণ লোক তেমন মাথা ঘামাত না, বরং কুসমালোচনা করত। এখন ত লোকে 'রবিঠাকুর, রবিঠাকুর' করে পাগল। ওঁর সম্বন্ধে দিন দিন কত বই বেরুচ্ছে, কত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে, কত গানের স্কুল খুলছে ; রেডিও খুললেই ওঁর গান শোনা যায়। সে সময়ে এত ছিল না। তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে সব বাঙ্গালী ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন, তার বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গ ও আসামের লোক।

এখন অবশ্য ব্রাহ্ম আর অ-ব্রাহ্মর তফাৎ বিশেষ বোঝা যায় না, আর নতুন করে কেউ ব্রাহ্মও হয় না। তবে পরবর্তীকাল

যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে যে, বাংলার আধুনিক সভ্যতায় ব্রাহ্মদের অবদান প্রচুর।

সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ববঙ্গের লোকেদের কৃপার চোখে দেখত ও নানাভাবে ঠাট্টা করত। ওদের নিয়ে কয়েকটা প্রবাদও তৈরী হয়েছিল যেমন, 'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখানো'; 'বাঙ্গালে গোঁ,' 'বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু, লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে ল্যাজ নেই কিন্তু' ইত্যাদি। তারাও পশ্চিমবঙ্গকে চোর ও ঠগের রাজত্ব বলত; পশ্চিবঙ্গের লোকেদের 'ঘটি চোর' বলত।

৫৫/৫৬ বছর আগে পদ্মা পার হয়ে মেঘনার পারে চাঁদপুরে যাই ও সেখানে স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেদের সব খালি পা, মাস্টার মশায়দের সব খালি পা, কেবল হেডমাস্টার মশায়ের পায়ে জুতো। বড় লজ্জা করতে লাগল জুতো পায়ে দিতে। আমিও বাড়ীতে ঝগড়া করে জুতো পায়ে দেওয়া ছাড়লুম। পরে দেখলুম এ সহরের উকিল-মোক্তাররাও খালি পায়ে থাকেন, মাত্র দু'দশ জন লোক জুতো পায় দিতেন। সকাল-সন্ধ্যে পুকুরে গিয়ে হাত পা মুখ ধোবার সময় ছেলে বুড়ো সকলে খড়ম পরত। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ও পরের আঙ্গুল দিয়ে খড়মের মুণ্ডি টিপে রাখলে পায়ের সঙ্গে খড়ম আটকে থাকে, চলতে গিয়ে পা থেকে সরে যায় না। এ খড়ম পরা বেশ শক্ত, ভাল অভ্যাস না থাকলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

সহপাঠিদের কাছ থেকে জানলুম, ওরা দিনে চারবার ভাত

খায়—সকালে, স্কুল যাবার আগে, স্কুল থেকে ফিরে আর রাত্তিরে শোবার আগে। এত ভাত খাওয়া শুনে অবাক লেগেছিল।

ওরা পশ্চিমবঙ্গের লোকদের ঘটিচোর বলতো, সংক্ষেপে বলত ঘটি। তা ঘটি নামটা খুব সার্থক দেওয়া হয়েছিল, কেননা জলে পড়লে তারাও ঘটির মত ভখ্‌ভখ্‌ করতে করতে তলিয়ে যায়। কিন্তু বাঙ্গালদের সে ভয় নেই, তারা সাঁতরে পার হয়; ছেলে বুড়ো সকলে, এমন কি যে কোন বয়সের মেয়েরাও।

যাই হোক, প্রথম প্রথম সহপাঠিরা আমায়, কলকাতার ছেলে বলে, খুব খাতির করত। পরে যখন খুব জানাশুনা হয়ে গেল, আমি ওদের কথ্যভাষা আয়ত্ত করতে লাগলুম, একটা লঙ্কা একটু নুন দিয়ে চিবিয়ে খাবার ক্ষমতা হল, তখন ওরা কেউ কেউ আমাকে বলত, কলকাতায় হালুম হুলুম করে কথা বলো কেন? আমায় জিজ্ঞাসা করত, কলকাতায় আমকে যদি আব বলে, তবে মামাকে কী বলে? আবার আর একজন সহপাঠির কথা বলি। তার গল্প লেখার ঝোঁক ছিল। সে বঙ্কিমী ভাষা ব্যবহার করত। আমাকে গল্প শুনিয়ে যেখানে যেখানে কথাবার্তা আছে সেগুলি 'কলকাত্তাই' ভাষায় রূপান্তর করে দিতে বলত।

সে সময়ে বাংলা ভাষার লেখকরা ছিলেন গোবিন্দ দাস, নবীন সেন ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাড়া প্রায় সব পশ্চিমবঙ্গের লোক, যেমন এখন লেখকরা বেশীর ভাগই পূর্ববঙ্গের লোক।

তখন পূর্ববঙ্গের লোকেরা, এমন কি ঢাকা কুমিল্লার লোকেরা

কলকাতায় আসতে ভয় করত; ভাবত ওখানকার লোকেদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে কি না। দীনেশ সেন মহাশয়ও প্রথম অবস্থায় কলকাতা আসার সময়ে খুবই অসোয়াস্তি ভোগ করেছিলেন।

পরে পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশাল জেলার সহরেও গেছি। সব জায়গায় লক্ষ্য করেছিলুম যে, সহপাঠিদের সকলেরই লেখা-পড়ায় একটা আন্তরিক নিষ্ঠা ছিল। ও সব জায়গায় অন্য আর একটা ব্যাপার ছিল। তা হল গুপ্ত ব্রহ্মচর্য-সমিতি। খুব অল্প সংখ্যক বাছা বাছা ছাত্রেরা এর সদস্য। এদের কাজ ছিল ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, দেশাত্মবোধক বই পড়া, আলোচনা করা ও কি করলে দেশ স্বাধীন হতে পারে তা চিন্তা করা। এ সব হত পুলিশের নজর এড়িয়ে। কলকাতার স্কুলের ছাত্রদের এ রকম কিছু ছিল বলে জানতুম না।

আগে বলেছি পূর্ববঙ্গের লোকেরা কলকাতায় আসতে ভয় পেত; অথচ পরবর্তী কালে দেখেছি, লণ্ডন এডিনবারা প্যারিসে পশ্চিমবঙ্গের লোকের চেয়ে ঢের বেশী সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের লোক পড়াশুনা করত। আরও পরবর্তী জীবনে দেখেছি (পার্টিশানের পর) কলকাতার সরকারী-বেসরকারী অফিসে যে সব টেবিলে টেলিফোন আছে, সে সব টেবিলে যাঁরা বসে আছেন তার শতকরা ৯০ ভাগই পূর্ববঙ্গের লোক। লেখাপড়ায় নিষ্ঠা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও 'বাঙ্গালে গোঁ' এই উন্নতির কারণ। তবে সর্দার প্যাটেল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর বড় চটা ছিলেন। উনি বলেছিলেন যে, এরা যখন বিদ্যায়, পেশায়, অর্থে পূর্ববঙ্গের

বাকী অধিবাসীদের চেয়ে ঢের উপরে, তখন তাদের অত্যাচারে এরা (হিন্দুরা) নিজেদের জন্মভূমি বাস্তুভিটে ছেড়ে দিয়ে ভীরুর মত পালিয়ে গেল, সব একজোট হয়ে রুখে নিজেদের অধিকারের জন্যে লড়লো না কেন ?

গত ২০ বছরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকদের জন্যে কলকাতার চলতি ভাষায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন, চললাম (চললুমের বদলে) চামচ্ (চামচে) আম (আঁব), লজেন্স্ (লজনচুষ), বিস্কিট (বিস্কুট) পরীক্ষা (এগজামিন), জ্যেঠিমা (জ্যেঠাইমা), দাদা দাদু (মশায়) শুরু (আরম্ভ), আপ্রাণ (প্রাণপণ) ইত্যাদি।

কতকগুলি কথা এখনও চালু হয় নি, যেমন, পোলাপান (ছোট ছেলে), বাসা (ভাড়া বাড়ী), মামাবাড়ী (মামার বাড়ী), ইসে (ইয়ে); ঘরের কোনায় (ঘরের কোনে), সবৃড়ি কলা (মর্তমান কলা), বোড়ই (কুল), ইচা মাছ (চিংড়ি মাছ) একত্তিরিশ (একৃতিরিশ), চৌচল্লিশ (চুয়াল্লিশ), সাথে (সঙ্গে), করিস না (করিস নি), মুঠি (মুঠো), ফাজিল, মুড়িঘণ্ট (মুড়োর ঘণ্ট) ইত্যাদি। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের slang ও প্রবাদ-বাক্য ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে বা লোকে ভুলে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তার জায়গায় শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রায় ৫০ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার ভদ্রঘরের মেয়েরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন না, কেউ জুতোও পরতেন না, ট্রেনে যাতায়াতের সময় ছাড়া। তাঁরা ট্রামেও চড়তেন না। কোথাও

যেতে হলে ঘোড়ার গাড়ীতে (পাল্কি তখন উঠে গিয়েছিল) বা মটরে যেতেন। কেবল ব্রাহ্ম মেয়েরা ও যাঁরা বাংলার বাইরে থাকতেন তাঁরা রাস্তায় হাঁটতেন ও জুতো পরতেন। পরে যখন পূর্ববঙ্গের মেয়েরা কলকাতায় থাকতে আরম্ভ করলেন, বাধ্য হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে লাগলেন তখন তাঁরা জুতোও পরলেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থাগতিকে কলকাতার মেয়েরা রাস্তায় বেরতে ও ট্রামে-বাসে চড়া আরম্ভ করলেন ও জুতো পরতে লাগলেন।

কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের উগ্র বাছবিচার ছিল। বাসি কাপড় না কেচে বা বদলে সংসারের কোনো কাজে হাত দেওয়া নিষেধ ছিল, গামছা পরার খুব চল ছিল। পায়খানায় গেলে কাপড় একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যেত, খেতে বসে কাপড়ে ভাত পড়লে কাপড় জামা সব অশুদ্ধ হত, ভাত খাবার সময়ে বাঁ হাতে জলের গ্লাসে জল খেয়ে কাপড়ে হাত দিলে কাপড় অশুদ্ধ হত। এখন কিছু বিলেত-ফেরৎ ও পূর্ববঙ্গবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে এ সবের উগ্রতা অনেক কমেছে। এখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ-বাসীদের মধ্যে তফাৎ অনেক কমে আসছে। তবে খবরের কাগজে প্রতি সপ্তাহে বিবাহের জন্য যে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকে, তাতে দেখি সব ক্ষেত্রেই পাত্রপাত্রী পূর্ববঙ্গের কি পশ্চিমবঙ্গের তা পরিষ্কার করে লেখা থাকে। এর কারণ হচ্ছে, সাংসারিক ও সামাজিক আচারব্যবহারে ও কথাবার্তায় তফাৎটা অনেকটা রয়েই গেছে।

পার্টিশানের পরে পূর্ববঙ্গের অবস্থা বলতে পারব না।

এবার ১৯৭০ সালের কলকাতার কথা বলি। তার আগে একটু জানিয়ে দিই যে গত ১৬/১৭ বছরের বেশীর ভাগ সময় অন্য প্রদেশে থাকার দরুন কলকাতার হালচাল যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল তার ঠিক খবর রাখি নি। এখন এখানে ছেলেরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে দিয়েছে, বুশসার্ট ও সরু প্যাণ্ট পরে। সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেমন বিয়ের বা পুজোর নিমন্ত্রণেও বুশসার্ট ও প্যাণ্ট। প্রবীণ লোকেরা এখনও আগের মত ধুতি-পাঞ্জাবি এমনকি উড়ুনিও ব্যবহার করেন। এখন লম্বা জুল্‌ফি রাখার চল হয়েছে, কেউ কেউ দাড়ীও রাখছে। মেয়েদের পেট-পিঠ-বেরোনো হাতকাটা নিচু-গলার ব্লাউজের বেশ চল হয়েছে। একজন লেখক এ-ব্লাউজের নাম দিয়েছেন 'ছেলেধরা ব্লাউজ'। কোনো ভালো ফাংশানে যেতে হলে যুবতীরা সেলুনে গিয়ে দশ টাকা খরচ করে মাথার উপর জাপানী প্যাটার্নের চুড়ো করেন।

পার্টিশানের পর থেকে কলকাতা ও শহরতলির লোকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। আরও বাড়ছে, মৃত্যুহার কম হওয়ার জন্যে।

কলকাতার সব রাস্তায় এত ভিড় যে হাঁটা যায় না। শ্যামবাজার, বৌবাজার, এসপ্লানেড, পার্কস্ট্রীট, ভবানীপুর, রাসবিহারী এভিনিউ, টালিগঞ্জ, গড়িয়াহাটা, হাওড়ার পুল—সব অঞ্চলেই সমান। মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। দুপুর ছাড়া ট্রামে-বাসে ওঠা ঝকমারি ব্যাপার। এই ভিড়ে মেয়েরা ট্রামে-বাসে উঠে কলেজ ও আফিসে যে কি অসুবিধায় যায় তা বলা

যায় না। মাঝে মাঝে বদ্‌মাইস লোকেরা ট্রামে-বাসে মেয়েদের উপর উপদ্রব করে বলে শোনা যায়।

গত কয়েক বছরে মটর গাড়ীর সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়েছে ও প্রতি বছরই বাড়তে থাকছে, রাস্তা বিশেষ বাড়ে নি। ফলে পথচারীকে রাস্তা পার হওয়ার অনেক রকম কৌশল শিখতে হয়। এত মটর দেখে তো মনে হয় লোকেদের খুব পয়সা হয়েছে। পয়সা নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হলে আর সংসারের রোজের বাজার মটর গাড়ীতে করে! নিউমার্কেটে নয় আগেও মটর গাড়ীতে বাজার করত, কিন্তু এখন বেশীর ভাগ বাজারের সামনে যান, দেখবেন কত লোক মটরে বাজার করতে এসেছে।

কলকাতার রাস্তায় এত বেশী লোক, এত বেশী মটর, বাস, ট্রাম, ট্রাক, টেম্পো, ঠ্যালাগাড়ী, রিক্সা, স্কুটার, সাইকেল, দাঁড়িয়ে-থাকা জঞ্জাল-ফেলা ঠ্যালাগাড়ী যে, বিস্তর এ্যাক্সিডেণ্ট হবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য তা হয় না। বোধ হয় সব লোকই খুব স্মার্ট। কিন্তু ৫/৭ বছর পরে কী হবে! এবং আরও পরে, ধরুন ১৫/২০ বছর পরে? দেখা যাক্, সি. এম. ডি. এ. কতটা উন্নতি করতে পারে।

তারপর রাতের বেলা। রাস্তায় আলো এত কম। তবে যে সব রাস্তার উপর দোকান আছে সেগুলিতে আলো হয়, দোকানের আলোটা বাড়তি পাওয়ার জন্যে। আর রাস্তার ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প! এগুলো তো কেবল দেখতে বাহার, এতে কি ঠিক মত আলো হয়! এ আলোর জোর নেই, রাস্তায়

লোক পারাপার করলে বোঝা যায় না। যদিও এর কারেণ্ট খরচা কম তবুও যে রাস্তায় মটর চলে সে রাস্তায় এ আলো একেবারে দেওয়া উচিত নয়। হাঁটা-রাস্তায় এ আলো বেশ ভাল; বাহারি দেখতে, চাঁদের আলোর কাজ করে, পথচারীর মনে কবিত্ব এনে দেয়, হাঁটার কষ্টটা লাঘব হয়। তারপর, অনেক মটরের ঠিকমত আলো থাকে না। হয় একটা সাইড লাইট নেই, নয় পেছনের লাল আলো নেই বা নাম্বার প্লেটের আলো নেই। আবার কোনো গাড়ী, বিশেষত ট্যাক্সি, একটাও আলো না জেলে চলে। এ সব যে কত বিপদ ডেকে আনে তা গাড়ীর চালক বোঝে না। রাস্তার পুলিশও এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। আবার কী রুচি—মাঝে মাঝে এমন মটরও চলে, যাতে সামনে ও পেছনে দুটো করে বাড়তি সবুজ রংয়ের আলো বা রেডিয়েটারের মাঝখানে একটা নীল আলো বা দু'দিকের দরজার উপর দুটো আলো। আর স্কুটার-চালিয়েদের কি সাহস! এত ভীড়ের রাস্তায় স্কুটার চালাবে স্ত্রী ও দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। এমন কি রাত্তিরেও কলকাতার আধা-অন্ধকার রাস্তায় এরকম একসঙ্গে চারজন চলছে, দেখতে পাবেন।

আর একটা বিশ্রী ব্যাপার হল সহরের রাস্তায় অসংখ্য ভিখিরী ও ফুটপাথবাসী, আর কিছু কিছু গোরু।

তাই বলছিলুম, কলকাতার রাস্তায় চলা এক সমস্যা। ইট ও পাথরকুচির স্তূপ, জঞ্জাল, গর্ত, বর্ষার জমা জল, রাস্তায়-বসা ফেরিওয়ালা, লোকের ভিড়, গাড়ীর ভিড় আর রাত্রে কম

আলো—এই সব মিলিয়ে রাস্তায় বেরনো কেবল সমস্যা নয়, মহা বিপদের কথা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের ভ্রমণকারীরা এখনকার কলকাতার জীবনধারা দেখে ও কলকাতাবাসীর অসুবিধে সহ্য করবার ক্ষমতা দেখে তাজ্জব বনে যায়। এ কথা ওদের ভ্রমণকাহিনীতে দেখতে পাই।

ওষুধের দোকানের ভিড় দেখলে অবাক হতে হয়। এখন এত লোকেও ওষুধ কেনে! দোকানের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। ভিড় দেখে মনে হয় ওষুধের দোকান করা খুব লাভের ব্যবসা। আর একটা লাভের ব্যবসা হল সন্দেশের দোকান করা। প্রায় সব দোকানে কিউ দিয়ে খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। সন্দেশের সাইজ ছোট হয়ে গেছে, ৫০ পয়সার সন্দেশ এই এত্তটুকু, তাও হু-হু করে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। কে বলে দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

আবার জিনিসের দাম যত বাড়ছে তত substitute ও তৈরী হচ্ছে। ভেজাল তৈরী হচ্ছে বললে আইনঘটিত দোষ হয়; সেই জন্যে একটা নতুন নামেতে তা বেরয়, তার গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে। যেমন ধরুন দুধ। দাম লাগে ১ টাকা ৮৫ পয়সা সের। কিন্তু সস্তায় দুধ ছাড়তে হবে, তাই substitute বের করা হয় বা বলে-কয়ে ভেজাল দেওয়া হয়। নাম দেওয়া হয় টোন্‌ড্‌ দুধ, ডবল-টোন্‌ড্‌ দুধ। আর একটা মজার দুধ আছে; সাধারণ লোক সেটাকে খাঁটি গোরুর দুধ বলে জানে। তার নাম দেওয়া হয়েছে conditioned cow's milk.

জিনিসের দাম বাড়ার কথা উঠলে কেবলমাত্র কলকাতার কথা বললে চলবে না। এ তো সারা ভারতবর্ষের সমস্যা—দিনকে দিন জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। এ বাড়া রোখা যেতে পারত যদি লোকে রীতিমত পরিশ্রম করত, কৃষি ও পণ্য উৎপাদন বাড়াত, স্ট্রাইক বন্ধ করত ও কালোবাজারি বন্ধ করত। কিন্তু এ সব কি সম্ভব ?

কলকাতায় এখন কিনডারগার্টেন স্কুল আর মেয়েদের গানের স্কুলের ছড়াছড়ি। কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জলসা পাড়ায় পাড়ায় লেগেই আছে। কলকাতাবাসীরা, মানে বাঙ্গালীরা ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন পেছিয়ে আছে, তেমনি শিল্পকলা, সংগীত, কবিতা ও নাটকে সারা ভারতের মধ্যে অগ্রণী। কলকাতা হল 'কলাভূমি কলিকাতা'। মনে হয় যেন লোকেরা কত সুখে শান্তিতে আছে।

আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই কয়েকটা করে আকাশ-ফাটানো চিৎকারের প্রতিবাদ-মিছিলও বেরুচ্ছে ও রাস্তা জ্যাম হচ্ছে। জহরলাল কলকাতাকে বলেছিলেন a city of processions, তাই শুনে আমরা বাঙ্গালীরা ভয়ানক রাগ করেছিলুম। ভাগ্যিস এখন উনি বেঁচে নেই ; বেঁচে থাকলে কলকাতায় এসে আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন।

দেশের বিস্তর লোক নানাসূত্রে বিলেত, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশে বাস করছেন। অনেকে সপরিবারে থাকেন। কেউ কেউ বিদেশকেই দেশ করে নিয়েছেন, দেশে

ফেরবার আর ইচ্ছে নেই। দেশের দুরবস্থা দেখে এঁদের আর দেশে থাকবার আগ্রহ নেই।

যাই হোক, সব চেয়ে উদ্বেগজনক খবর হল, ১৯৭০ সালের কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গ একটা ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্যে কী আছে, ভগবান জানেন।

আধুনিক গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের ধারা কি ভাবে বইছে তার একটু বিবরণ দিই—

১। কিছু লেখার ধরন হল সাপ-খেলান। সাপুড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঝাঁপির ডালা খুলল, সাপ আস্তে আস্তে মাথা তুলল, ফণা ধরল, বাঁশির ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এপাশ ওপাশ হেলতে লাগল; কিছু সময়ের পর বাঁশিতে ছোবল দিতে গেল। সাপুড়ে অমনি ঝপ্ করে বাঁশি সরিয়ে নিল। সাপ আবার ছোবল দিতে গেল, সাপুড়েও বাঁশি সরিয়ে নিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ খেলা চলল। তারপর সাপুড়ে বাঁশি থামাল, ঝাঁপির ডালা দিয়ে সাপকে ঝাঁপির ভেতরে ঢুকিয়ে ডালা বন্ধ করে চলে গেল। খেলা শেষ অর্থাৎ, কেবলই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করবার চেষ্টা, কৌতূহল প্রশমনের কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। গল্পে বা উপন্যাসে এমন সব সিচ্যুয়েশন তৈরী করা হয় যাতে suspense প্রচুর, কিন্তু suspense-এর অন্তে climax বলে কিছু নেই। লেখকের ঝোঁক থাকে সর্বদাই একটা কী-হয় কী-হয় গোছের থমথমে কৌতূহল সৃষ্টি করে কাহিনীকে অযথা টেনে বাড়াবার দিকে; সেটা যে শুধু কাহিনীর প্রয়োজনেই করা হয় তা নয়, কখনও কখনও অর্থকরী প্রবৃত্তি থেকেও করা হয়, টেনেটুনে কাহিনীর দৈর্ঘ্য বা বিস্তার ঘটাতে পারলে লেখকের প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হয় বেশী; কিন্তু পাঠকের

উদ্রিক্ত কৌতূহলকে নিবৃত্ত করাটাও যে একটা আবশ্যকীয় কাজ তা প্রায়ই লেখকের মনে থাকে না।

২। 'সেক্স' নিয়ে লেখা একে একে অনেক লেখক আরম্ভ করেছেন, কেউ কেউ আবার কাঁচা 'সেক্স' নিয়ে লিখছেন। তা লিখবেন না কেন? স্কুল কলেজের লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে হবে পাঠক ও ক্রেতা। বিপুল চাহিদার জন্যে পাঠাগারে এই-সব বই রাখতে হবে। দেশের ছেলে মেয়েরা যে গোল্লায় যাচ্ছে, তা দেখবার দরকার নেই। পকেটে টাকা এলেই হল। তবে এ কথাও সত্যি যে, বাইবেল, ডাক্তার স্পক-এর 'চাইল্ড কেয়ার' (Baby and childcare by Dr. Benjamin Spock) ও আরও ২/৪ টা বই বাদ দিলে, পৃথিবীর বেস্ট-সেলার হল অশ্লীল বই।

৩। আর এক ধরনের লেখার ফ্যাশান হয়েছে। তা এই রকম—নায়ক অথবা নায়িকা এক জনকে বিয়ে করবে, দ্বিতীয় জনের সঙ্গে প্রেম করবে আর তৃতীয় আর এক জনের সঙ্গে নিছক কামসম্পর্কে আবদ্ধ হবে। এ সব কাহিনী এমনভাবে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ও যুক্তি দেখিয়ে লেখা হয় যাতে মনে হবে যে এরূপ কার্যকলাপই স্বাভাবিক; সাধারণ এবং সমাজ যে কেন তাকে স্বীকৃতি দেয় না, তা এ সব লেখকদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়।

৪। অনেকে মোপাসাঁকে টপ্কাবার চেষ্টা করেন। ধরুন, একটা গল্প লিখতে চাই যাতে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত পুরুষের এক সন্ধ্যায় কোনো সূত্রে আলাপ হল। আলাপ

ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল। ঘণ্টা তিন চারের ভেতর হোটেলে ডিনার খেয়ে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গেলেন, সেখানে তাঁদের দৈহিক মিলন সাধিত হল; তারপর ঘণ্টা দুই কথাবার্তার পর ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে খুন করলেন ও লাস সরিয়ে ফেললেন। এটা গল্পের বা উপন্যাসের আকারে যে লেখক গুছিয়ে লিখতে পারবেন তাঁর বাহাদুরি আছে। মনে রাখতে হবে, এক রাতের ভেতর প্রথম আলাপ, ঘনিষ্ঠ হওয়া, মিলন হওয়া, তারপরেও কথাবার্তা বলা ও শেষে খুন করা! দুজনেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। এঁদের কেহই পাগল নন।

কিছু লেখক চেষ্টা করছেন এই ধরনের গরম গরম বিষয় নিয়ে লিখতে, কিন্তু মোপাসাঁর নিপুণ, সাবলীল ও ঠাসবুনন লেখার মত কি উতরোচ্ছে? যা উতরোয় তা অস্বাভাবিকতায় ভরা। তা হলেই বা, কিছু গরম ও অশ্লীল বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা হল ত, তা হলেই হল।

৫। প্রায় সব লেখকই মেয়েদের মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণে একটু বেশী রকম গভীরে যান। মেয়েদের মনের তলায় কী তোলপাড় হচ্ছে, কী খেলা হচ্ছে, তা পুরুষের ধারণার বাইরে। এ তো কিংবদন্তী। পুরুষ লেখকদের এ কাজে হাত দেওয়া অনধিকার চর্চা; যদিও আগের দিনে প্রাতঃস্মরণীয় লেখকেরা তা করে গেছেন। দেশে এখন অনেক লেখিকা হয়েছেন, তাঁদের হাতে নারীচরিত্র-বিশ্লেষণ ছেড়ে দেওয়া হয় না কেন, আর পাঠকরাই বা এ অন্যায় বরদাস্ত করবেন কেন!

৬। অনেক দিন ধরে জানবার ইচ্ছে, বড়লোকেরা যাঁরা

প্রাসাদে থাকেন (রাজপ্রাসাদে নয়, ফ্লাটেও নয়) তাঁরা এখনকার দিনে কি ভাবে জীবন যাপন করেন। এ সম্বন্ধে কোনো বই পাই না। পল্লীজীবন, সাধারণ গৃহস্থ-জীবন, ভিক্ষুকের জীবন, বস্তির জীবন, বখাটে ছেলেদের জীবন, বেশ্যাদের জীবন, কারখানা-কোলিয়ারীর জীবন, বনেদী গরিব লোকেদের জীবন নিয়ে চিত্তাকর্ষক গল্পের বই ও উপন্যাস আছে। সে সব নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা বলে খুবই চমৎকার ও স্বাভাবিক হয়ে থাকে। কিন্তু বড়লোকদের কাহিনী লেখায় মুশকিল আছে (না কি এখন দেশে আর বড়লোক নেই?); লিখতে হলে তাঁদের বারমহল আর অন্দরমহলের পাক্কা খবর রাখতে হয়। এ সম্বন্ধে যে একেবারে বই নেই তা নয়; যা আছে তা পড়লে বোঝা যায় সবটাই আন্দাজে লেখা। লেখক কল্পনার উপর নির্ভর করে কাহিনী বিস্তার করেন, ঠেকে গেলেই অস্বাভাবিক কার্যকলাপের আশ্রয় নেন ও নায়ক-নায়িকাকে আধ-পাগল হিসেবে চিত্রিত করেন। লক্ষ্য করবেন, সব লেখকেরই বড়লোক নায়ক বা নায়িকারা অপ্রকৃতিস্থ। এদের চরিত্র আঁকা হতে পারে, যদি বড়লোকেরা নিজেরা কিংবা তাঁদের প্রাইভেট সেক্রেটারী, সরকার বা গোমস্তা-জাতীয় কেউ কলম ধরেন; অথবা কোনো লেখক যদি খুব অন্তরঙ্গ ভাবে তাঁদের সঙ্গে মিশে থাকেন। এরকম লেখকের অভাবে আমরা তাঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বা যা জানি তা ভুল।

৭। লেখকের সচ্ছল অবস্থার নায়ক যদি ব্যবসায়ী হয়, তবে সে হয় জোচ্চোর; যদি বড় চাকরে হয়, তবে হয় গবেট ও

চরিত্রহীন। কম মাহিনার কর্মচারীরা হয় বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সৎ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা শ্লেষাত্মক কথা মনে পড়ে গেল—'দারিদ্র্যের অহংকার'। যাক, কিছু লেখকের এই দোষটি তাঁদের বইতে দেখা যায়।

৮। দেশভ্রমণের বইতে পাঠক আলোচ্য দেশ ও দেশের অধিবাসীদের কথা জানতে চায়; লেখকের নিজের কাহিনী জানতে চায় না। আর জানতে চায় না দেশভ্রমণের বইতে মেয়েদের সংগে প্রেমের কাহিনী। কিন্তু এই দুটো বিষয় ভ্রমণ সম্বন্ধীয় বইয়ের প্রধান অঙ্গ বলে লেখকরা মনে করেন এবং খুব রং ফলিয়ে তার বর্ণনা দেন। অথচ যে যে জায়গায় যাওয়া হল তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ম্যাপ দেওয়া যে অত্যন্ত দরকারি তা মনে করেন না; তবে ভ্রমণ যদি কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার হয়, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

সাহিত্যিক জ্ঞান জাহির করবার জন্যে যে ভ্রমণের বই লেখা হয় তা পড়ে ভ্রমণেচ্ছু কোনো লোকের উপকার হয় না, সে বই বিছানায় শুয়ে পড়বার জন্যে। অবসর বিনোদনের জন্যে। কথা হচ্ছে, সে রকম বইকে কি 'ভ্রমণের বই' বলা হবে?

৯। দেশভ্রমণের বইতে, লেখা গরম ও মচ্‌মচে করবার জন্যে, অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যে কাহিনী চালানো হয়। যেমন শুনুন একটা লেখা (সংক্ষিপ্ত আকারে)—…তারপর নিউ দিল্লীতে বাবার বন্ধুর ভাই নিতাইচন্দ্র দত্তর বাড়ীতে ট্যাক্সি করে গিয়ে উঠলুম। ভদ্রলোক খুব বড় অফিসার (ভগবান জানেন), বেশ বয়স হয়েছে, দ্বিতীয় পক্ষের অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী,

নাম লতিকা, ছেলেপুলে নেই (নইলে মজা হবে কেন)। সেখানে বেশ আরামে রইলুম। মিস্টার দত্ত আফিসে গিয়ে গাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন দিল্লীর সব দ্রষ্টব্য স্থান আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখাতে। তিন চার দিন পর সিমলা যাব ঠিক করলুম। লতিকা মিস্টার দত্তকে বল্লেন, এই গরমেতে তিনিও আমার সঙ্গে সিমলা যেতে চান। স্বামী তৎক্ষণাৎ রাজী। আমরা দুজন সিমলা পৌঁছলুম। কিন্তু মুশকিল হল কোনো হোটেলে জায়গা নেই, কেবল একটা হোটেলে একটা ঘর কোনো রকমে দিতে পারে। লতিকা বল্লেন, তা আর কি হবে, নিয়ে নিন। আমরা তিন দিন এক ঘরেই ছিলুম······ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইটাই সবিস্তারে খুব সরস করে লেখা, পড়লে দেহমন চনমন করে উঠবে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে সমস্তটাই ডাহা মিথ্যে; লেখক দিল্লীতে কালীবাড়ীতে উঠেছিলেন, কোনো স্ত্রীঘটিত ব্যাপারই হয় নি। কিন্তু পাঠক সন্দেহ করবে কেন যখন অত নাম ধাম জানিয়ে দিয়ে লেখা হচ্ছে? দিল্লীর মত অতবড় শহরে কে আর নাম-ধাম যাচিয়ে দেখছে! পাঠক খুব আনন্দ পেল, লেখকের বই খুব বিক্রী হল। একটা ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য আছে—A traveller may lie with authority. আর একটা কথা আছে—Traveller's tale, যার বাংলা হল, আষাঢ়ে গল্প। ভ্রমণকারীদের নামে এইসব অপবাদ আছে। আমাদের দেশের লেখকরা কি এসব কথা জানেন না?

১০। বিদেশে দু'তিন সপ্তাহ বাস করে এমন ভ্রমণ-

কাহিনী লেখা হয় যা পড়লে মনে হবে লেখক সেই বিদেশ-বাসীদের আচরণ, চিত্তবৃত্তি, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে পোক্ত হয়ে গেছেন। অথচ তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে হোটেলের চাকর চাকরাণী, কেরানী ও পোর্টার আর ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছ থেকে। আর হয়ত দু'চারটে মিটিং এ দু'চারজন শিক্ষিত বিদেশীর সঙ্গে মিনিট দশেক আলাপ করে বা এক-আধ জনের বাড়ীতে চা বা ডিনারে নিমন্ত্রণে গিয়ে। এই অভিজ্ঞতাতেই লেখক সাজান্তা হয়ে যান।

১১। কিছু বিখ্যাত সাহিত্যিক বৃদ্ধবয়সে পৌঁছে এমন লেখা বের কচ্ছেন, যা দেখে মনে হয় তাঁদের মতিভ্রম হয়েছে। এক কালে যাঁদের আমরা মাথায় তুলে রেখেছি, তাঁদের বৃদ্ধ-বয়সের লেখার বিরূপ সমালোচনা করে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়। তাঁদের লেখার অভ্যাসকে বাধা দেওয়াও ঠিক নয়। তাঁরা যেমন লিখছেন লিখে যান।

১২। আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠাবান লেখক কূপমণ্ডূক হওয়ার দরুন, তাঁদের লেখার উৎকর্ষতা স্থিতিশীল হয়ে আছে। তাঁরা অন্যদেশে গিয়ে লোকেদের সঙ্গে মিশলে ও তাদের সঙ্গে বাস করলে, নিজেদের লেখার মান অনেক উন্নত করতে পারেন। কূপমণ্ডূক সাহিত্যিক বিশ্ববরেণ্য হতে পারেন না।

১৩। 'সেক্স' নিয়ে বই লেখা সম্বন্ধে একটা দরকারী কথা লেখা হয় নি, এখন লিখছি। এসব লেখকদের নিশ্চয় দেখতে হয় কতদূর অবধি রং চড়িয়ে লেখা যায়, যাতে আইন-ঘটিত অপরাধ না হয়। হয়ত বা সেজন্যে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিতে

হয়। কেননা বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে, যেমন 'হঠযোগ' (বিশেষ লজ্জা সহকারে বলছি যে কলেজ-জীবনে বটতলার পাতলা চারখণ্ড এই বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছিলুম) বা Lady Chatterley's Lover-এর (এই তিনশো পৃষ্ঠার বইটা অনেক বছর আগে পোর্ট সৈয়দে কিনে পড়েছিলুম) standard এর বই হলে তা আমাদের দেশে proscribed হয়ে যাবে, ঘরে টাকার আণ্ডিল আসা বন্ধ হবে। সেজন্যে আইনটা কী জানার দরকার। অবশ্য আইনেরও অনেক মারপ্যাঁচ আছে। অশ্লীলতাকে আইনত চাপা দেওয়া যায় এই ভাবে যুক্তি দিয়ে—প্রাকৃতিক আচরণ যদি 'সার্থকভাবে' 'ফুটিয়ে তোলা' হয় আর তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়, তবে তা হয় 'শিল্পকাজ'। কোনো শিল্পকাজ কখনও অশ্লীল হতে পারে না। ব্যাস্, লেখকের পোয়াবারো।

ব্যাবহারিক দর্শন

পৃথিবীতে লক্ষ রকমের জীব আছে, তার মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। আমরা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। আমরা কথা বলি, হাসি, কাঁদি ; আমরা চিন্তা, আলোচনা, বিচার করতে পারি। সে জন্যে এটা স্বাভাবিক যে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা জাগে। যেমন, আমরা কে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, আমাদের জীবনের অর্থ কি, এই সংসারের অর্থ কি, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

মানবজীবনের উৎপত্তি থেকে যতই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত হতে থেকেছে, ততই মানুষের কাছে এই প্রশ্নগুলি গভীর ভাবে দেখা দিয়েছে। তার উত্তর দিতে গিয়ে পণ্ডিতেরা এই সব প্রশ্ন ও সমস্যা একেবারে গোড়া থেকে বিচার করে দেখেছেন। তাঁরা আরম্ভ করেছেন বস্তু, বস্তুর অস্তিত্ব, উৎপত্তি, গতি, শক্তি, বৃদ্ধি, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আত্মা, চেতনা, আনন্দ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ধর্ম, নৈতিক আচরণ, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা সমালোচনা দিয়ে। তাঁরা হয় যুক্তি দ্বারা মত প্রকাশ করেছেন, নয়তো নানান কাহিনী দিয়ে বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য রচনা করে ওই সমস্ত প্রশ্নের বিচার করেছেন ও নানা মত দিয়েছেন। সমগ্র ভাবে দেখলে এই বিষয়টা হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে ওই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। সকলেই দুর্বোধ ভাব ও ভাষার দ্বারা জটিলতা সৃষ্টি করেছেন।

দর্শনশাস্ত্রে যে সকল প্রশ্নের বিচার-বিবেচনা করা হয় তার মধ্য থেকে মাত্র একটি প্রশ্নের হয়তো কার্যকরী উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্নটি হল, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি ? উত্তর, শান্তি ও আনন্দ। তার সঙ্গে জ্ঞানচর্চা বা ধর্মচর্চা বা ভগবদ্‌চিন্তার হয়তো কোনো যোগাযোগ নেই, কিন্তু কি করলে তা পাওয়া যায় সেইটাই বিচার্য। দর্শনশাস্ত্রের যে অংশ জড়বাদ বা Materialism-এর অন্তর্গত, আমরা সে অংশকে আরও বিস্তৃত করে নিয়ে বলব ব্যাবহারিক দর্শন বা Practical Philosophy। তারই আলোচনা এখন করা যাক।

সব জীবের মত মানুষকে বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। অন্যান্য জীব এটা করে কিছু না-ভেবে-চিন্তে, কেবল সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা ; কিন্তু মানুষ সংগ্রাম করে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে, একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে। মানুষকে বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম তো করতেই হবে, তা ছাড়া জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত অন্য অনেক কর্তব্য আমরণ করে যেতে হবে। সবেরই লক্ষ্য হবে শান্তি ও আনন্দ লাভ করা।

কিন্তু শান্তি ও আনন্দের অন্তরায় হচ্ছে মানুষের দেহের ও মনের কষ্ট। দেহের কষ্ট হয়, রোগ-যন্ত্রণা অনাহার অর্থাভাব থেকে ; মনের কষ্ট হয়, শোক দুঃখ অর্থাভাব আলস্য উদ্বেগ নিরাশা অপমান থেকে। রোগ-যন্ত্রণা এড়ানোর জন্যে চিকিৎসা-বিদ্যা আছে, তার অনেক উন্নতিসাধন হয়ে চলেছে ; কিন্তু তবুও অনেক মানুষ পাঁচ বছর দশ বছর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছে। শোকজনিত কষ্ট মেনে নিতেই হবে, মৃত্যু এড়ানো যায়

না ; তবে সান্ত্বনার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। মনের অন্য কষ্টের কারণ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করতে হবে, অন্ততঃ ঘটলেও যাতে তার তীব্রতার অনুভূতি কম হয় তার চেষ্টা করতে হবে। যা পারা যাবে না, তা সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আর একটা বড় ব্যাপার আছে ; তা হল ভাগ্য। কখনও কখনও বহু চেষ্টাতেও কোনো একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মেলে না, আবার কখনও নামমাত্র চেষ্টাতেও তা মিলে যায়।

এই রকম নানান সমস্যা বোঝবার জন্যে ও সমাধানের জন্যে দরকার বিদ্যাচর্চা ; তা থেকে হয় বিচারবুদ্ধি। বিদ্যার মত সাংসারিক মানুষের কাছে অর্থ একটা বড় জিনিস। অর্থের সচ্ছলতা থাকলে শান্তি ও আনন্দের পথ অনেক সুগম হয়।

শান্তি-ও-আনন্দ প্রসঙ্গ অন্য দিক দিয়েও ভেবে দেখা যেতে পারে। একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। অনেক বছর আগে লণ্ডন থেকে ভারতবর্ষে ফেরার সময়ে জাহাজে এক পাগলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পি. এণ্ড ও. কোম্পানির জাহাজে মার্সেলস থেকে রাত্রে উঠি। পরের দিন ভোরবেলায় ডেকে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে এক ভারতবাসী যাত্রী আমার সামনে এসে হঠাৎ হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল, What's your name? আমি অবাক হয়ে তার দিকে চাইলুম ও একটু পরে নাম বললুম। ও বললে, But I did not see you all these days! বললুম, আমি টিলবারী থেকে জাহাজ ধরি নি, কাল রাত্রে মার্সেলস থেকে উঠেছি। ও বললে, Have you got

cigarettes? আমি একটু অবাক হয়ে সিগারেট বের করে ওকে দিলুম ও সেটি দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিলুম। ঠিক সে সময়ে আর একজন হন্ হন্ করে ওর কাছে এসে হিন্দিতে বললে, এক্ষুণি চল, তোমাকে চান করতে হবে। লোকটা সুড়সুড় করে তার সঙ্গে সিগারেট খেতে খেতে চলে গেল।

খবর নিয়ে জানলুম, লোকটি অক্সফোর্ডে পড়ছিল, এবং সে বম্বে ইউনিভারসিটির একজন ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্র। কিছুদিন হল মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর সম্প্রতি ওর বাপ মারা গেছে। এখন বম্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একজন বম্বেওয়ালা বিজনেস-ম্যানের হেপাজতে। সেদিন দুপুরে আবার ওর সঙ্গে দেখা হল। আমার কাছে এগিয়ে এসে ও বললে, Hallo old man, how are you? আমি বললুম, আজ ওয়েদারটা বেশ ভাল। ও বললে, হ্যাঁ, ওয়েদার ভাল। আমি ক্যাপ্টেনকে এই মেডিটেরানিয়ানে জাহাজ জোরে চালাতে বলে দিয়েছি, দেখেছ কত জোরে যাচ্ছে? আমি বললুম, তুমি ক্যাপ্টেনকে বললে, তাই ও জোরে চালাচ্ছে? লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, আশ্চর্য, তুমি জান না যে, আমিই এই জাহাজের মালিক, ক্যাপ্টেন আমার এমপ্লয়ী! যদি তুমি বল, জাহাজ আমি এক্ষুণি থামিয়ে দিতে পারি। বলে ও মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। আমি বললুম, হ্যাঁ, একবার থামিয়ে দাও না। ও বললে, আচ্ছা দিচ্ছি। বলেই যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থেমে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে, না, এখন থামাব না, তা হলে

পোর্ট সৈয়দ-এ পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে। পরে জেনেছিলুম পি. এণ্ড ও.-র মালিক লর্ড ইন্‌চ্‌কেপের নাতি (তিনিও লর্ড ইন্‌চ্‌কেপ) এই জাহাজে তাদের বম্বে আফিসে যাচ্ছেন। পাগলের ধারণা হয়েছিল যে, ও নিজে লর্ড ইন্‌চ্‌কেপ। একদিন লর্ড ইন্‌চ্‌কেপ লাউঞ্জে বসে আছেন দেখে আমি পাগলকে বললুম, যাও না ওঁর সঙ্গে কথা বল গিয়ে। পাগল উত্তর দিল, Why should I ? If he wants to speak, he can come to me. পাগলকে দেখতুম লাইব্রেরীতে গিয়ে ছবির বই-এর পাতা ওল্টাতে আর মাঝে মাঝে ডেকে বসে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে। শেকস্‌পীয়ার মিল্টন প্রভৃতি খুব আবৃত্তি করত আর হাসত। বলত, অক্সফোর্ডের প্রফেসারেরা ওর চেয়ে কোনো কিছু বেশী জানে না। ওর গার্ড ভদ্রলোক (সেই বিজনেসম্যান) যদিও ওকে চোখে চোখে রাখতেন, তবুও ওর জন্যে কোনো উদ্বেগ ছিল না। গার্ড ভদ্রলোক বলেছিলেন, ও কারুর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে না, কোনো অনিষ্ট করার ঝোঁক নেই, কেবল খায় বেশী, ঘুমোয় বেশী। 'বারে' দেখেছি, কেউ দিলে বিয়ার বা হুইস্কি খেত হাসিমুখ করে, তবে কোনো আগ্রহ ছিল না।

তের-চোদ্দ দিন এই লোকটির আচার-ব্যবহার দেখে কেবলই মনে হয়েছিল, লোকটা তো বেশ আছে। সব সময়ে হাসিখুসি, যেন কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, নিজেই নিজের উপর সন্তুষ্ট, এমন কি নিজের কৃতিত্বের অহংকার করে, বাপ মারা যাওয়ায় শোক নেই। শুনেছি পাগলদের নাকি অসুখ-বিসুখও

বিশেষ হয় না। ভাবতে লাগলুম এই রকম হাসিখুসি পাগল হতে পারলে জীবনে আর কী দরকার?

বেশ, তাই যদি হয় তো পশুপক্ষীর জীবনটাই বা কি খারাপ? মনে হয় পশুপক্ষীরা বেশ শান্তি ও আনন্দেই আছে। কিন্তু যখন পশুপক্ষী হয়ে জন্মাই নি ও পাগলও নই, তখন পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় মানুষকে একটা ধারা অনুসরণ করে চলতে হবে, জীবনে যতটা সম্ভব শান্তি ও আনন্দ আনবার উদ্দেশ্যে।

সে ধারার গোড়ার কথাগুলি আমরা ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছি; দুঃখের বিষয়, বেশী বয়সে কার্যগতিকে মানুষ তা প্রায় ভুলে যায়।

এই ছেলেবেলার উপদেশগুলি, পণ্ডিতরা পৃথিবীটা অনেক দেখে-শুনে, দিয়ে গেছেন। উপদেশগুলি এই—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, গুরুজনে ভক্তি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ, ধর্মে মতি, কর্তব্যে মতি, বিবেক মানা। শোক দুঃখ যন্ত্রণা ঈশ্বর দিয়েছেন বলে মেনে নিয়ে সহ্য করবার শক্তি আনা। এগুলি হল basic উপদেশ। বাকী উপদেশ মানুষের বয়স, জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতে জানা হয়ে যাবে। মানুষের সারাটা জীবনেই তো জ্ঞান লাভ হয়।

বর্তমান জীবনধারায় শৈশবকাল বাদ দিলে, মানুষের জীবন দু'ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম ছাত্রজীবন, দ্বিতীয় কর্মজীবন। মৃত্যুর দিন অবধি কর্মজীবন—কর্ম করে যেতে হবে, যদি সামর্থ্য

থাকে। শেষ জীবনেও যথাসম্ভব পরিশ্রম করা দরকার, শরীর নীরোগ ও কর্মঠ রাখবার জন্যে।

ছাত্রজীবনের মুখ্য কাজ হল লেখাপড়া, ব্যায়াম ও পারিবারিক খুচরোখাচরা কাজ। এ ছাড়া অবসর-বিনোদন। খেলাধূলা ও বন্ধুবান্ধবদের জন্যে বিকেলে দু'তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ব্যায়াম মানে ব্যায়াম-স্কুলের ব্যায়াম। ফুটবল, ইত্যাদি খেলা ও সাঁতার হবে বাড়তি। ঠিকমত ব্যায়ামে দেহ লম্বা-চওড়া ও জোরালো হয়, শরীর নীরোগ হয়, অপরের সম্ভ্রম পাওয়া যায়। নিয়মিত ব্যায়ামে যৌবনের কাম-উদ্দীপনা কমে যায়, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্যে ইহা বড় দরকারী।

বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনকালের কর্মধারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির দ্বারা ঠিক করা সম্ভব নয়। অভিভাবকদের এটা ঠিক করে দিতে হবে এবং একটু কড়া হাতে করতে হবে।

কর্মজীবনের আরম্ভ হল চাকরি ব্যবসায় ইত্যাদি কোনো বৃত্তিতে নিজেকে নিয়োগ করা, যাতে যশ ও সদুপায়ে অর্থ অর্জন করা যায় ও উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি করা যায়। অর্থচর্চা ও বিদ্যাচর্চা সমান তালে করে যেতে হবে। High living, high thinking নীতি মেনে নিতে হবে। এর জন্যে উচ্চাভিলাষ থাকা দরকার ও কঠোর পরিশ্রম দরকার। সৎপথে থেকে পরিশ্রম ও বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা উন্নতি সম্ভব। পরিশ্রম দেহ ও মনকে সুস্থ রাখে। পরিশ্রমের পুরস্কার আসবেই,

কারুর ক্ষেত্রে আগে আসবে, কারুর বা পরে। জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়লে ও যশ এলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। অর্থ এলে পরিবারবর্গের সচ্ছলতার দরুন আনন্দ হবে ও উদ্বৃত্ত অর্থ দান করে আনন্দ আনতে হবে।

রক্‌ফেলারের ব্যবসায় যখন খুব ভাল ভাবে চলছে তখন তাঁর সেক্রেটারি তাঁকে বলেন যে টাকা অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে, তা দিয়ে কী করা হবে, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। রক্‌ফেলার ঠিক করলেন, এই অগাধ বাড়তি টাকা দান করলে প্রচুর ইন্‌কামট্যাক্স বাঁচবে, তা ছাড়া নানা দেশের লোকের উপকার হবে ; তিনি তাই দান করতে লাগলেন। অগাধ দানের গভীর আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তি নিশ্চয় তিনি পেয়েছিলেন।

আবার উল্টো উদাহরণও আছে। যেমন ওয়াল্‌ট্‌স্ ডিসনের বেলায়। তিনি 'মিকিমাউস' ও 'ডোনাল্ড ডাক' ছবি করে বিস্তর টাকা উপায় করেন ও কালিফোরনিয়ায় ছোটদের ও বড়দের জন্যে একটা খেলার রাজত্ব তৈরী করান। নাম দেন 'ডিসনে ল্যাণ্ড'। খেলা ছাড়া এটা শিল্প-বিজ্ঞান ইতিহাস-ভূগোল চোখে দেখে শেখবার জায়গা। আধুনিক সপ্তম আশ্চর্য যদি কিছু থাকে তো তার মধ্যে নাকি এটাকে একটা বলে গণ্য করা যায়। ডিসনে সাহেব এটা তৈরী করে লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দ দিচ্ছেন। আশা করা অন্যায় হবে না যে, এর দরুন তিনি নিজে জীবনে বেশ শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু তা হয় নি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি বলতেন, টাকা উপার্জন করতে জীবনভোর যত উদ্বেগ, সংগ্রাম ও অশান্তি

তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যা করে গেলেন তা was not worth it ; তার মানে দাঁড়ায় যে তিনি শান্তি ও আনন্দ পান নি।

এ তাঁর দুর্ভাগ্য বলতে হবে। চরম দুর্ভাগ্য। এঁর জীবন দেখে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, বেশী রোজগারের কি দরকার ? অল্প আয়, অল্প লেখাপড়াতেই জীবনটা বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়, অত ঝঞ্ঝাটের দরকার কি ?

কিন্তু এ রকম কথা হল অলসতার নামান্তর। অলসতা করা বা পশুপক্ষীর মতন জীবন যাপন করা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাজে না। এর বিস্তারিত আলোচনা প্রথমেই করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বলা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের করা উচিত। সংসারে থাকলে আমাদের এই Practical Philosophy বা 'ব্যাবহারিক দর্শন' অনুসরণ করতে হবে। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বা বৈরাগ্য পালন করলেও শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, অথবা কেউ যদি নিজের খেয়ালে গান গেয়ে বা অন্য কোনো শিল্পচর্চা করে আনন্দ পায়, তাদের জন্যে এ প্রবন্ধ নয়, এ সংসারী সাধারণ মানুষের জন্যে। আর সাধারণ দর্শনশাস্ত্র বড় ধোঁয়াটে, সংসারী মানুষের তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না, কেবলমাত্র academic interest-এ তা চর্চা করা যেতে পারে।

মোট কথা, মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে আনন্দই হলো সকল কাজের ও চেষ্টার মূল লক্ষ্য। আনন্দের সন্ধানেই মানুষ পৃথিবীময় ছুটে বেড়াচ্ছে কি আর-কিছু করছে। সুতরাং

আনন্দ আমাদের জীবনের কেন্দ্রে গ্রথিত হলে তবেই সার্থকতার নাগাল পাওয়া যায়। এই কারণে খুব উৎফুল্ল হই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধকদের নাম রাখার পদ্ধতি দেখে। মিশন এই পার্থিব জীবন সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা করে সাধকদের কী চমৎকার নামের প্রচলন করেছেন! এঁদের সকলকার নামের শেষে থাকে 'আনন্দ' কথাটা। কী স্বর্গীয়, কী বাস্তব এই কথাটা! ভাবি, আমরা—পৃথিবীর এই সাধারণ লোকেরা—কবে আমাদের জীবনের সঙ্গে 'আনন্দ' যুক্ত করতে পারব!

লোকটি কে?

জন্ম ২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৫ সাল। কলকাতার সিমলে অঞ্চলে ৫নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে মাতামহ জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর (নন্দকুমার চৌধুরীর পুত্র) বাড়ীতে। পিতা গৌরকৃষ্ণ বসু ডিস্ট্রিক্ট ও সেসান জজ ছিলেন। মাতা হেমপ্রভা দেবী। পিতামহ চন্দননগর-নিবাসী যদুনাথ বসু।

লেখাপড়া করেছে কলকাতায় ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে, পূর্ববঙ্গে চাঁদপুর ও পিরোজপুর স্কুলে, বাঁকুড়ায় ওয়েস্‌লিয়ান কলেজে, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেসরকারী ও আধা-সরকারী চারটি প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ, অ্যামেরিকান, চেকোস্লাভ ও যুগোস্লাভদের সঙ্গে বাংলা, বেহার ও জম্মু-কাশ্মীরে মোট ৩৭/৩৮ বছর চাকরি করেছে। ১৯২৯-৩১ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে বিলেতে ছিল। দুটো নতুন যন্ত্রের খসড়া তৈরী করেছিল। এর যে-কোনো একটা দিয়ে, মটর গাড়ী যখন চলে তখন দেখাবে পেট্রল কত খরচা হচ্ছে— miles per gallon। দুটোর বিলিতী patentও নিয়েছিল। কিন্তু কোনোটাই কার্যকর করতে পারে নি।

বিয়ে করেছে কলকাতা কম্বুলোটোলার হেম কর লেনের নরেশচন্দ্র করের (হেম করের পুত্র) মেয়েকে। নাম আভা। তিন মেয়ে; দুজন কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে পড়েছে। এক মেয়ে বরাবর ইংরেজি স্কুল-কলেজে।

লোকটির স্বভাব ও দোষ-গুণগুলো নম্বর-ওয়ারি করে লেখা হল—

১। বেঁটে, রোগা ও শ্যামবর্ণ। সাজ-পোশাক ঢিলেঢালা।

২। কথাবার্তায় আকর্ষণী শক্তি নেই; কিন্তু দুর্মুখ। একবার একটা সংস্থার চেয়ারম্যানকে তাঁর চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নামে বলেছিল—Oh! He is a great engineer. He can build castle in the air. You give him a paper and a pencil; no, even these aren't necessary; he would mentally calculate and give you figures and ideas as to how to build the castle. He is a genius.

৩। কিছু বাতিকগ্রস্ত। বাড়ীতে সিনেমার বই ঢুকতে দেয় না, অন্ততঃ তাই চেষ্টা করে। ভাগ্য-গণনায় একেবারে বিশ্বাস নেই। অনেক বছর আগে Illustrated Weekly of India-র নিয়মিত গ্রাহক ছিল। হঠাৎ এক সংখ্যা থেকে What the stars foretell বেরোতে আরম্ভ করল। তা দেখে ম্যাগাজিনটা নেওয়া বন্ধ করে দিল।

৪। গোবেচারার মত থাকে, কিন্তু অহংকার আছে আর উপদেশ দেবার বাতিক আছে। চাকরি-জীবনের শেষ প্রতিষ্ঠান থেকে চলে আসবার সময়ে ফেয়ারওয়েল মিটিং-এ বলেছিল—আমার এত বছর অভিজ্ঞতার দরুন আমি ইয়ংম্যানদের একটা উপদেশ দিতে চাই। এতে আমি নিজের অহংকার করছি, একথা কেউ মনে করবেন না। জীবনে উন্নতি করতে হলে,

দৈনিক মাত্র ৬ ঘণ্টা কি ৮ ঘণ্টা কাজ করলে চলবে না ; ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করা চাই। আফিসে বেশীক্ষণ থাকতে হবে, বাড়ী গিয়েও আফিসের জন্যে আরও কাজ করতে হবে কিংবা পড়াশুনো করে আরও পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনেও কোনো না কোনো কাজে লেগে থাকতে হবে। এ করেও বিশ্রামের জন্যে, diversion-এর জন্যেও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। এগার মাস কাজ করবার পর এক মাস ছুটিতে বিশ্রাম করুন, আনন্দ করুন, দেশভ্রমণ করুন, বই পড়ুন, লিখুন। প্রতি কৃতী ব্যবসায়ী এই রকম পরিশ্রম করেন, তাঁদের কাছে ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। আমি একজন অতি সাধারণ মেধার ছেলে ছিলুম, খুঁটির জোরও ছিল না ; কেবল যা বললুম সেই ভাবে কাজ করবার চেষ্টা করে শেষের দিকে ৭/৮ বছর মাসে আড়াই হাজার টাকা মাহিনা পেয়েছি। ধারে কাটতে না পেরে ভারে কেটেছি। যাক, আপনারা আমার এই উপদেশটা স্মরণ রাখবেন।

৫। গান গাইতে জানে না। ওস্তাদি গান শুনতে ভালবাসে, তবে রাত-ভোর নয় বা পয়সা খরচ করে নয়। খেলাধুলো, সিনেমা-থিয়েটার বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তেমন উৎসাহ নেই। সাঁতার জানে এবং পছন্দ করে। সমুদ্রেও কিছু সাঁতার কেটেছে। বলে, প্রত্যেক মানুষের এত বড় জীবনে বহুবার জলে নাবার, নৌকো, স্টীমার ইত্যাদি চড়ার দরকার হয়, এবং তা হলে প্রতিবারই তার জলে ডুবে মারা যাবার আশংকা থাকে। এ আশংকা যাতে না থাকে সেটা করা এমন কিছু

শক্ত ব্যাপার নয়; একটু যত্ন করলেই সাঁতার শেখা যায়। তা ছাড়া পৃথিবীর তিন ভাগ জলটা কী, তার একটু মোকাবিলা করব না, কেবল একভাগ মাটিকে জানলেই হবে? সেই জন্যে সকলকে উপদেশ দেয় সাঁতার শিখতে ও লাইফসেভিং শিখতে। আর বলে, যে সাঁতার জানে না সে কখনও জলে নাববে না বা নৌকো চড়বে না; যদি একান্তই পুকুরে-নদীতে স্নান করতে হয় বা নৌকো চড়তে হয় তো সঙ্গে একজন সাঁতার-জানা লোক থাকা চাই।

৬। লোকটির ইংরেজ-প্রীতি একটু বেশী। বিলেতে থাকতে বাঙ্গালী বা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতো না, কেবল ইংরেজদের সঙ্গেই মিশতো। বলতো Do in Rome as the Romans do. কিন্তু এ সত্ত্বেও English accent ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে নি, বাঙ্গালীর মতই ইংরেজী বলে।

৭। মটর গাড়ীতে উৎসাহ আছে। নানান দেশে কি কি গাড়ী তৈরী হয় তার খবর রাখে। যেখানে যা মটর রেস হয় খুব উৎসাহ নিয়ে তা পড়ে ও আলোচনা করে।

৮। মেয়েদের সঙ্গ ভালবাসে। তাদের পেলে একটু উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এই বইয়ের সমালোচনা

পরচর্চা করা, বলে কয়ে করলেও, গর্হিত কাজ; যদিও এ পরচর্চার ভেতর অসূয়া বা বিদ্বেষ নেই বরং কিছুটা হিউমার-আছে, পরিহাস-রসিকতা আছে, আর আছে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—তা হল যাঁদের সমালোচনা করা হয়েছে, লেখক যেন তাঁদের ভক্ত।

বই-এ একটু অতিশয়োক্তি, অসংগতি ও একটু বেশী 'আমি' 'আমি' আছে।

পাঠক যদি এই কথাগুলি বিবেচনা করে বইটা পড়ে থাকেন, তা হলে হয়তো একটু মজা পেলেও পেয়ে থাকতে পারেন।

ইতি—লেখক

পাঠশুদ্ধি

পৃঃ ২৪ সব তলার লাইন 'Miss World' এ শেষ হয়েছে। এর পরের অংশ হবে:—'বিউটি কনটেষ্টে সেরা সেরা সুন্দরীদের মাপ হয়—৩৫"—২৩"—৩৫"।

পৃঃ ৪৫ সব তলার লাইন 'প্রযোজ্য' কথায় শেষ হয়েছে। এর পরের অংশ হবে:—'Probability থিয়োরীতে কেবল negative aspect বিবেচনা করা হয়েছে।'

পৃঃ ৪৮ পঞ্চম লাইনে 'best dressed' স্থলে 'best-dressed' হবে।

পৃঃ ৫১ একাদশ লাইনে 'সাঁতার শেখে' স্থলে 'সাঁতার শেষে' হবে।

পৃঃ ৬৬ পঞ্চম লাইনে 'আর কোন্' স্থলে 'আর কত' হবে।

পৃঃ ৭৭ দশম লাইনে 'আর অন্য' স্থলে 'তার অন্য' হবে।

পৃঃ ৮১ চতুর্দশ লাইনে 'তিক্তিবিরক্ত' স্থলে 'তিতিবিরক্ত' হবে।

পৃঃ ৯১ তৃতীয় লাইনে 'রাধাকৃষ্ণ' স্থলে 'রাধাকান্ত' হবে।